কবিতার কথা

বিমলকৃষ্ণ সরকার





সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ছয়

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। অগ্রহায়ণ ১৮৮১ শকাব্দ

বর্ণলিপি : খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক . কৃষ্ণলাল ঘোষ

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড। ৯ রায়বাগান স্ট্রীট। কলকাতা ৬

মুদ্রক : ক্ষীরোদচন্দ্র পান

নবীন সরস্বতী প্রেস। ১৭ ভীম ঘোষ লেন। কলকাতা ৬

বাঁধাই : নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডার্স

৫বি পাটোয়ারবাগান লেন। কলকাতা ৯

পাঁচ টাকা

স্বর্গত পিতৃদেবের স্মরণে

বর্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য কাব্যস্বরূপের যৌক্তিক বিশ্লেষণ। ভূমিকা ও প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় এই কাব্যস্বরূপ এবং বিষয়টির উপরে দৃষ্টি রেখেই আমি পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে কবিতার লক্ষ্য, রূপবৈচিত্র্য ও প্রকরণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে যথাক্রমে কবিতার ইতিহাস ও বাঙলা কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। অধ্যায় দুটি অংশত পূর্বালোচিত প্রসঙ্গসমূহের দৃষ্টান্তস্বরূপ; তবে প্রয়োজন অনুসারে স্থানে স্থানে আনুষঙ্গিক বিষয়ও উত্থাপিত হয়েছে।

বইটিতে কোনো মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপনের প্রয়াস নেই। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে সব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাদের মধ্যে আমি শুধু একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ যথাস্থানে স্বীকৃত হয়েছে।

'সুপ্রকাশ'-কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থরচনা সম্ভব হত না। তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দিল্লী
ডিসেম্বর ৭, ১৯৫৯

বিমলকৃষ্ণ সরকার

ভূমিকা

কাব্যের বয়ঃক্রম ঠিক কত সেটা অনেকটা অনুমানসাপেক্ষ, তবে অন্তত তিন হাজার বছর আগে যে মহৎ কাব্যের সৃষ্টি হয়—এবং আমাদের এই ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই আদিম কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'ঋগ্বেদ'—জার্মান মনীষী ম্যাক্স্‌মূলরের ভাষায় যা 'আর্য মানবের প্রথম কণ্ঠোত্থিত বাণী।'

কাব্যের তুলনায় কাব্যজিজ্ঞাসার বয়স কিন্তু মোটেই কম নয়, কারণ এই ঋক্—এবং অথর্ব—বেদেই এর একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের যাঁরা রচয়িতা তাঁরা তাঁদের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলেছেন : 'গিরিক্রান্ত আনন্দপ্রবাহের মতো আমাদের সংগীত বৃহস্পতির কাছে গিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে', 'হে গায়ক ভুলো না, তোমার এই বাণী উত্তর যুগে অনুরণিত হবে', 'যিনি কবি তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির দ্বারা বহুবিধ রূপ কল্পনা করেন'। এই আত্মসচেতনতা খুব বিস্ময়কর নাও মনে হতে পারে, যেহেতু বৈদিক কবি 'সত্যদ্রষ্টা ঋষি' এবং স্বয়ং সবিতৃ-দেবতা অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি 'অপৌরুষেয়'। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বাদ দিলেও দুটি বস্তু এখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও কবির কলাদক্ষতার তুলনামূলক বিচার এবং পরবর্তী অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত রসের একটা ক্ষীণ পূর্বাভাস। শিল্পনৈপুণ্যের চেয়ে বিষয়বস্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে ঋগ্বেদ-রচয়িতা বলেছেন, 'আমি ক্রিয়ারত প্রাণী নই, আমি মানুষও।' রসতত্ত্বের বীজ এখানে নিহিত আছে, একথা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে, তবুও নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দুটি লক্ষণীয়: ব্রহ্ম 'ছন্দোরসের সাহায্যে তাঁর কার্যসাধন করেন' ('ঋগ্বেদ),

'হে আলোকের দেবগণ, মধু দিয়ে আমাকে ভরিয়ে দাও যাতে আমি মহিমময় শব্দ সর্বসাধারণের কাছে উচ্চারণ করতে পারি' (অথর্ববেদ)।

যাঁরা আদিকবি বলে পরিচিত তাঁদের অনেকেই কাব্যের মধ্যে তাঁদের শিল্পকর্মের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ক্রৌঞ্চপত্নীর শোকে বাল্মীকির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ্ ছন্দে যে বাক্য উচ্চারিত হল তিনি নিজেই তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তাকে শ্লোক নামে অভিহিত করেছেন। হোমার 'ইলিয়ড'এর তৃতীয় সর্গে বলেছেন, দৈব প্রেরণা ছাড়া শুধু কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে কেউ মহাকাব্য রচনা করতে পারেন না। ঐ সর্গেরই অন্যত্র মেনেলেয়াস ও ইউলিসিসের বক্তৃতা আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি হেলেনের মুখ দিয়ে বাগ্মিতা অর্থাৎ শব্দালংকারের প্রকারভেদ নির্ণয় করেছেন। আদিকবিদের এই কাব্যজিজ্ঞাসা অবশ্য যুক্তিপ্রধান তত্ত্বে পরিণত হয়েছে অনেক পরে—গ্রীসে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অর্থাৎ অ্যারিস্টফ্যানিস, সক্রেটিস ও প্লেটোর যুগে এবং ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে যখন ভরত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র' প্রকাশ করেন।

কবিতা কি—কাব্যের ব্যাপারে এইটিই মূল প্রশ্ন এবং এর সন্তোষজনক মীমাংসার অর্থ কাব্যের স্বরূপ নির্ধারণ। এ কাজটি অবশ্য মোটেই সহজসাধ্য নয়, কারণ কাব্য শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, অনুভববেদ্যও বটে। শেষ বিচার মুখ্যত যুক্তিসাপেক্ষ হলেও তার আগে যা ঘটে তাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব', অর্থাৎ কবির হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন। কাব্যে প্রকাশিত আবেগ যেন সাময়িকভাবে 'সহৃদয়' পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত হয়, এবং তিনি তখন কবির অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন। কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক, তার উৎপত্তিস্থান এই অন্তর্জগৎ—যেখানে অনুভূতি ছাড়া প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না।

কিন্তু শুধু অনুভূতিকে পাথেয় করে কোনো সমালোচকই বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন না, কারণ এ কথা ভুললে চলবে না যে কবিকর্মের উৎস যাই হোক না কেন, তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং বস্তু

হিসাবেই তা গ্রহণীয় ও বিচারযোগ্য। যিনি বিচারকের আসন গ্রহণ করেন তিনি যদি তাঁর প্রাথমিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে তিনি কাব্যজগতের উপান্তেই পড়ে থাকবেন, তার মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারবেন না। এইজাতীয় বিড়ম্বনা বহু তথাকথিত কাব্যবিচারকের ভাগ্যে ঘটেছে। যাঁরা স্বভাবতই রসবেত্তা, যেমন রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল বা ইংরেজ লেখক হ্যাজলিট—তাঁরা যেন কতকটা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাহিত্যসৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তাঁর কাব্যবিচার মুখ্যত অনুভূতিনির্ভর এবং প্রায় কাব্যধর্মী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'মেঘদূত' প্রবন্ধ এবং 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতার মধ্যে কোনো মৌলিক প্রভেদ চোখে পড়ে না। ছুটি রচনাতে একই সুরের ঝংকার শোনা যায়। সে সুর 'বিচ্ছেদ ক্রন্দনে'র, যা তিনি শুনেছেন কালিদাসের 'মেঘমন্দ্র শ্লোকে'। যেখানে তিনি চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন সেখানেও মনে হয় চরিত্রগুলি নূতন রূপ ধারণ করেছে—যেমন 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র ঊর্মিলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা।

মোহিতলাল ও হ্যাজলিটের দৃষ্টিভঙ্গী এতটা কাব্যাশ্রয়ী না হলেও এঁদের সমালোচনাও প্রধানত আবেগময়। এঁদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল অসাধারণ, সেইজন্য আবেগপ্রবণতা সত্ত্বেও তাঁরা কাব্যশাস্ত্রের একাধিক গ্রন্থি মোচন করেছেন। কিন্তু যাঁরা সাধারণ পর্যায়ে পড়েন তাঁরা শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকেন, ফলে তাঁদের বক্তব্য যতটা আত্মজীবনীমূলক হয় ঠিক ততটা সমালোচনাশাস্ত্রসম্মত হতে পারে না। তবুও এইজাতীয় রচনা একেবারে উপেক্ষণীয় নয় এই কারণে যে এতে এক ধরনের কাব্যপ্রীতি প্রকাশ পায় এবং কখনও কখনও তা পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়।

বর্তমানে আত্মগত, রোমান্টিক রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে, এবং সাহিত্যবিচারকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করার

চেষ্টা চলেছে। তাতেও অবশ্য বিভ্রান্তির অবসান ঘটে নি। 'নানা মুনির নানা মতের' গোলকধাঁধা তো আছেই, উপরন্তু শব্দবিশেষকে কেন্দ্র করেও নানারকম ভ্রান্তিবিলাসের উদ্ভব হয়।[১] সাহিত্য-বিচারের এটা একটা অপরিহার্য অঙ্গ, কারণ আজও বিচারকার্যের জন্য কোনো সর্বজনগ্রাহ্য বিজ্ঞানসম্মত শব্দকোষের সৃষ্টি হয় নি।

সাহিত্য তিনটি বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়—পদ্য, গদ্য ও নাট্যরূপে। পদ্য, গদ্য ও নাটক বলতেই সাহিত্য বোঝায়। এগুলি বাদ দিলে সাহিত্যের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। ইংরেজীতে বিজ্ঞান-সাহিত্য, দর্শন-সাহিত্য ইত্যাদি কথার প্রচলন আছে, কিন্তু বাঙলা বা অন্য ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য ললিতকলার একটি অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়।

কাব্য, গদ্য এবং নাটক—এদের প্রত্যেকেরই সাধারণ অভিধা যদি সাহিত্য হয়, তাহলে এদের মধ্যে কোনো মৌলিক প্রভেদ থাকার কথা নয়, এবং প্রকৃতপক্ষে নেইও। পরে আমরা কাব্যের যে কয়েকটি প্রধান লক্ষণ বিচার করছি[২] সেগুলি নাটক ও গদ্যের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও কাব্য এবং নাটক বা গদ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কাব্যের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার।

কাব্য গদ্য থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত হয় এর ছন্দোবদ্ধতার জন্য। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বাক্য মানেই যে কাব্য নয় তার প্রমাণ শুভংকরীর সূত্র। এখানে মিল ব্যবহার করার একমাত্র উদ্দেশ্য পাটীগণিতের নীরস বিধানগুলিকে ছাত্রদের স্মৃতিগম্য করে দেওয়া। বস্তুত শুভংকরীরচিত ঐ ভয়াবহ 'পদ্য'ই শুধু নয়, যে কোনো কবিতা গদ্য

১। 'ধ্বনি', 'রস', 'ভাব', 'ইমোশন', 'ফিলিং', 'এক্সপেরিয়েন্স', 'ইমাজিনেশন', 'ইমেজারি' প্রভৃতির শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ লক্ষ্য করলে কথাটির যাথার্থ্য অনুভূত হবে।

২। প্রথম অধ্যায়।

রচনার চেয়ে অনেক সহজে কণ্ঠস্থ করা যায়। তার কারণ কবিতার পরিপূর্ণ অখণ্ডতা, এর বিভিন্ন অংশের অবিচ্ছেদ্যতা। নাটক বা উপন্যাসও শিথিলবদ্ধ নয়। কিন্তু এর মূল ভাব কাহিনী ও পাত্রপাত্রীর মধ্যে নিহিত থাকে বলে অনেকটা বুদ্ধিগ্রাহ্য, এবং সেই ভাবটুকু গ্রহণ করেই আমরা ক্ষান্ত হই, শব্দ বা বাক্যবিন্যাসের দিকে আমাদের তেমন দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু কাব্যের তাৎপর্য পুরোপুরি শব্দনির্ভর, প্রত্যেকটি শব্দের উপর লক্ষ্য না রাখলে অর্থোপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কবিতা সহজে মুখস্থ করতে পারার কারণ শব্দের প্রতি এই গভীর মনোযোগ। এখানে কোনো কিছুই অনাবশ্যক নয়, কিন্তু বিষয়বস্তুকে অবিকৃত রেখে উপন্যাস থেকে কতক অংশ স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া চলে, অন্তত সংকুচিত করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে' সুরেশ ও অচলার ডিহরী যাত্রার পরে কেদারবাবু ও মৃণালের বার্তা আরো সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যেতে পারত। এবং তাতে সম্ভবত কাহিনী আরো সুসম্বদ্ধ হত। নাটকেরও কোনো কোনো অংশ হ্রস্বীকৃত হতে পারে—যেমন 'ম্যাকবেথ'এর ম্যালকম্-ম্যাকডাফ দৃশ্য। এ মন্তব্য অবশ্য নাটকটির কাব্যাংশের প্রতি প্রযোজ্য নয়, এবং যে উপন্যাসের রূপকলা সম্পূর্ণরূপে শিল্পসম্মত—যেমন ফ্লবেরের 'মাদাম বোভারি' বা হেনরি জেমসের 'অ্যাম্বাসাডরস'—তারও কোনো অংশ বাহুল্যবোধে বর্জন করা যায় না। কিন্তু এখানেও কাহিনী ও চরিত্র মুখ্য আকর্ষণ, শব্দ ও বাক্য এদের অনুষঙ্গ মাত্র।

কবিতার আর একটি বিশেষত্ব এই যে এর সার্থক অনুবাদ শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। তার কারণ দ্বিবিধ—ভাবগত এবং ভাষাগত। কবিতার ভাব বিশ্লেষণ করা যায় না, অথচ ভাষান্তরিত করতে গেলেই বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায় তার সঙ্গে মূল কবিতার কোনো আত্মিক যোগ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর ইংরেজী অনুবাদ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাহিনীমূলক কবিতা কিছুটা মূলানুগ হতে পারে, কেননা এখানে কাহিনী ও চরিত্র অনুবাদকের কাছে একটা স্থূল আশ্রয়স্থলের মতো। কিন্তু ভাবের

ব্যঞ্জনা যে রচনার প্রাণস্বরূপ তা কোনোমতেই তাঁর ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসে না। কাব্য অথবা কাব্যধর্মী নাটকের অনুবাদ সেইজন্য মূল গ্রন্থের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। উপন্যাস সম্পর্কে অবশ্য একথা খাটে না। এর ঘটনাপুঞ্জ, এমনকি একই অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলেও তাদের যোগসূত্র আদৌ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এবং সেই কারণে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাষানৈপুণ্যের সাহায্যে যে কোনো লেখক একে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারেন। মূলগ্রন্থ যে পটভূমিতে রচিত হয়েছে অনুবাদের মধ্যে তার ঔজ্জ্বল্য কিছুটা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু তাতে অর্থোপলব্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

কবিতায় ব্যবহৃত ভাষাও যে অনুবাদের পরিপন্থী হয় তা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে যা ভাষান্তরে ফুটিয়ে তোলা খুব দুরূহ ব্যাপার। অন্যত্র যা দুরূহ কবিতায় তা অসম্ভব, কারণ এখানে শব্দবিশেষের আভিধানিক অর্থের চেয়ে তার ধ্বনিমাধুর্য বা গাম্ভীর্য, ভাবানুষঙ্গ, ব্যঞ্জনা—অর্থাৎ বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের দ্যোতনা এবং প্রতীকতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এবং বলা বাহুল্য এগুলি শক্তিমান অনুবাদকেরও অনধিগম্য।

রূপনারানের তীরে
জেগে উঠিলাম[৩]

—এখানে 'রূপনারান' শব্দটির অর্থ নদী, আবার চিন্ময় সত্তা। অনুবাদে এর যে কোনো একটি অর্থ প্রকাশিত হতে পারে কিন্তু তাতে কবিতাটির নিহিত অর্থ কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে? কিটসের 'এনডিমিয়ন' কবিতার প্রথম চরণ কারও কারও মতে প্রথমে এইভাবে লিখিত হয়:

A thing of beauty is a constant joy.

পরে কিটস 'a constant joy'এর পরিবর্তে লেখেন 'a joy for ever'। অনুবাদের পক্ষে এ পরিবর্তন প্রায় অনাবশ্যক, যদিও

৩। রবীন্দ্রনাথ: 'শেষ লেখা'

'constant' (অবিশ্রান্ত) ও 'for ever'(চিরকালের জন্য) ঠিক সমার্থক নয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 'for ever' কথাটি প্রয়োগ করাতে পঙ্‌ক্তিটির গূঢ় অর্থ আশ্চর্যরকম বদলে গেছে। 'For ever' শব্দ দুটি পড়লেই ইংরেজ পাঠকের কানে বাজবে রোমান্সের 'For ever and a day' এবং গির্জায় প্রার্থনাকালে উচ্চারিত স্বস্তিবচন 'for ever and ever, Amen'।[৪] অনুবাদক্রিয়ার দ্বারা নিশ্চয় ঐ আনুষঙ্গিক আবেগ সৃষ্টি করা যাবে না।

৪। F. W. Bateson : *English Poetry* (Pp. 47-48) দ্রষ্টব্য।

কবিতা কি ?

কবিতা ও শব্দালংকার

কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়াস নিরর্থক। ইংরেজী ইডিয়মের অনুকরণে বলা যায় সেটা ভাগীরথীকে বঙ্কিমান করার চেষ্টার অনুরূপ হবে। সুতরাং এ পণ্ডশ্রম না করে কবি কি সৃষ্টি করেন ও কিভাবে সৃষ্টি করেন এবং পাঠকের মনে তাঁর রচনা কি প্রতিক্রিয়া জাগায়—এই বিষয়গুলির প্রতি মনোনিবেশ করলে হয়তো কবিতার স্বরূপনির্ণয় কাজটি অসম্ভব হবে না।

কবি আমাদের হাতে যা সমর্পণ করেন তা এক কথায় বলা যায় ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি বাক্য। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি এমনভাবে গ্রথিত হয় যে পঠনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝংকার আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। এই ঝংকারের উৎপত্তি ছন্দ থেকে, 'ছন্দোবদ্ধ' কথাটি সেইজন্য অর্থপূর্ণ। কিন্তু ছন্দ শব্দসমূহের সংযোজক মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে কাব্যসৌধ নির্মিত হয় শব্দসম্ভারের দ্বারা। সুতরাং শব্দের উপরই প্রথমে আমাদের চোখ পড়ে। কিন্তু সেখানেই যদি আমাদের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাহলে সৌধের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ইট-পাথরের মনোহারিত্বেই আমরা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ব। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে ঠিক এইজাতীয় বিভ্রমের একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ অর্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। অর্থকে বাদ দিয়ে শব্দের অলংকরণ কল্পনাও করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অলংকারের কোনো নিজস্ব সৌন্দর্য নেই। যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে অলংকার কবিতার অঙ্গীভূত হয় নি, অর্থাৎ কবিতাটি শিল্পসার্থকতা অর্জন করে নি। সার্থক কবিতার শব্দালংকার যাঁরা খুশিমত অর্থ

থেকে বিশ্লিষ্ট করে তারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁদের নামকরণ করেছেন দেহাত্মবাদী। কবিতা যে ভাবের রূপ সেটা ভুলে গিয়ে তাঁরা রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। ভাবের রূপ বললেও ঠিকমত বলা হয় না, কারণ তাতে এ দুয়ের পৃথক সত্তা কল্পনা করা হয়। আসলে ভাব ও রূপ মিলিত হয়ে যে অখণ্ড সত্তার উদ্বোধন করে তাকেই বলা চলে কবিতা। অতএব রূপ যখন অলংকৃত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে ভাবও অলংকৃত হয়। অলংকৃত রূপের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অসম্ভব, এবং যেসব আলংকারিক এই অসাধ্য সাধনে প্রয়াসী হন তাঁরা শব না হলেও দেহব্যবচ্ছেদ করেন।

অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ ভাবকে সমৃদ্ধ করলেও এটি কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। বস্তুত সম্পূর্ণ অলংকারবিহীন কবিতার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর পর লিয়র পাঁচবার শুধু 'never' কথাটি উচ্চারণ করল, এবং তাতেই যেন তার ট্র্যাজেডি আরো অর্থপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল।[১] ওআর্ডসওআর্থের 'মাইকেল' কবিতাতে বৃদ্ধ কৃষক যখন তার একমাত্র পুত্রকে হারাল তখন তার পিতৃহৃদয়ের বেদনা এই কয়েকটি সহজ অনলংকৃত কথায় প্রকাশিত হয়েছে: 'And never lifted up a single stone.' আবার প্রয়োজনবোধে ধ্বনিবহুল শব্দসম্ভারও এঁরা ব্যবহার করেছেন। যেমন, ডানকান-হত্যার ভয়াবহতা স্মরণ করে ম্যাকবেথ বলছে, আমার হাত অগণিত সমুদ্রকে রক্তাক্ত করে দেবে, 'multitudinous seas incarnadine.' ওআর্ডসওআর্থের 'প্রেলুড'এ অনুরূপ শব্দগাম্ভীর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের বর্ষাবিষয়ক দুটি কবিতা 'বর্ষার দিনে' ও 'বর্ষামঙ্গল' এখানে উল্লিখিত হতে পারে; একটিতে আমরা দেখি সহজ, অনাড়ম্বর ভাষার পরাকাষ্ঠা:

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

১। Shakespeare: *King Lear*.

অপরটিতে অনুপ্রাসের ধ্বনিময়তা :

স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।

কবিতার বিষয়

উপরে যা বলা হল তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কাব্যের ভাষা কি রকম হবে,—অলংকৃত না অনলংকৃত—সেটা নির্ভর করে কবির ভাবের উপর। কবিতা এই ভাবেরই আবেগময় অভিব্যক্তি। ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি ভাবের বাহনমাত্র নয়, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। কবি যখন কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন তখন তাঁর মনে ভাব অথবা অনুভূতির সঞ্চার হয়। বিষয়টি অণোরণীয়ান কিংবা মহতো মহীয়ান হতে পারে। রামসীতার বিচিত্র ইতিহাস, কুরুপাণ্ডবের দ্বন্দ্ব, প্যারিস কর্তৃক হেলেন হরণ, রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ, পথের ধারে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রস্ফুটিত একটি ফুল, ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংসরূপ,[২] চলমান আধুনিক রেলওয়ে এক্সপ্রেস[৩]—সবকিছুই কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হতে পারে। বহির্জগৎ প্রধানত এই বিষয়ের আধার, আবার কখনও কখনও শিল্পী স্বকপোলকল্পিত বিষয়ের দ্বারাও উদ্দীপিত হন :

মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা—

সুয়োরানী, দুয়োরানী ও কঙ্কাবতী এখানে রূপকথার রাজ্যের অধিবাসী, বাস্তব জীবনের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কবির শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে এরা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, এবং বর্ষাস্নিগ্ধ এক বিশেষ ক্ষণে অনুভূতির দিক দিয়ে তারা কবির কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। রূপকথা, লোকগাথা, ছড়া ইত্যাদি সামাজিক বা সমষ্টিগত চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক-

---

২। T. S. Eliot : *The Waste Land*
৩। Stephen Spender : *The Express.*

রহিত নয়, সেইজন্ত এদের দ্বারা প্রভাবিত কবিতাবলীর আবেদন খুব সীমাবদ্ধ নয়, তবুও মহৎ শিল্প বলতে যা বোঝায় তা কখনো সর্বতোভাবে শিল্পীর চিত্তাশ্রয়ী হতে পারে না। কোনো কবিই বস্তুজগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তাঁর নিভৃত চিত্তলোকে বিহার করতে পারেন না। 'দুঃখসুখের ঢেউখেলানো' এই মানব-সাগরের তীরই তাঁর প্রধান আশ্রয়। এরই ধুলাবালির উপর জীবনের যে বিচিত্র লীলা চলেছে একটা বিশেষ মুহূর্তে তারই আকস্মিক প্রতিফলন হয় তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে। এ প্রতিফলন কেন হয়, কি করে হয়—এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। একটি ছোট কথা—যেমন 'যেতে নাহি দিব' (রবীন্দ্রনাথ) অথবা 'What, you are stepping westward' (ওআর্ডসওআর্থের 'Stepping Westward) কবির মানসিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে ; অথচ সাধারণের কাছে, এমন কি ঐ বিশেষ মুহূর্ত বাদ দিলে কবির কাছেও, কথাটির কোনো মূল্য নেই। কবির মন অত্যধিক মাত্রায় সংবেদনশীল এবং সেইজন্য তিনি সহজে অভিভূত হন—এ রকম একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে ঠিক রহস্যভেদ হয় না, এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যা যেখানে অচল সেখানে ক্রিয়াবিশেষের উপর অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রেও অনেকে বলেন কবিকর্মের মূলে আছে ঐশী প্রেরণা।

ঐশী প্রেরণা, স্মৃতি ও স্বপ্ন

ঐশী প্রেরণার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কবিরা কাব্যরচনা করেন এ ধারণা বাস্তবিক পক্ষে বহু প্রাচীন ও সুপ্রচলিত। কাব্যজগতে এটা একটা ঐতিহ্যের মতো। সুতরাং এর মধ্যে যে কিছুটা সত্য রয়েছে তা মেনে নিয়ে প্রেরণাবাদের নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। বাল্মীকির কবিত্বশক্তিলাভ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী শোনা যায় তা এই প্রেরণা-বাদেরই প্রথম আভাস। হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'তে যে মিউজ বা বাণীবন্দনা রয়েছে তাতেও প্রেরণালাভের কামনা অভিব্যক্ত হয়েছে। পরে ভার্জিল, দান্তে, মিলটন প্রভৃতি মহাকবি যেভাবে

হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তাতে অবশ্য সন্দেহ হতে পারে যে বাণীবন্দনা মহাকাব্য রচনার একটা প্রচলিত রীতি মাত্র। কিন্তু দান্তে বা মিলটনের মতো প্রতিভাধর শিল্পী নিয়মরক্ষার জন্য একটা বিশেষ উপায় অবলম্বন করবেন এটা কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। তা ছাড়া শুধু মহাকাব্য নয়, অন্য ছন্দোবদ্ধ রচনা, বস্তুত প্রায় প্রত্যেক মহৎ শিল্পকর্ম যে কতকটা অলৌকিক, এ স্বীকৃতি কবিদের উক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে একাধিক বিশ্ববিশ্রুত কবি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রেরণাবাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। শেক্সপিয়রের 'মিড সামার্‌স্ নাইট্‌স্ ড্রিম'এ থিসিউস বলছে :

The lunatic, the lover, and the poet,
Are of imagination all compact :
One sees more devils than vast hell can hold ;
That is the madman ; the lover, all as frantic,
Sees Helen's beauty in a brow of Egypt :
The poet's eye in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven ;
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

এটি শুধু নাটকীয় উক্তি নয়, কবির দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে শেক্সপিয়রের সুচিন্তিত মন্তব্য।

উইলিয়ম ব্লেকের মতে কবি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, একটা বিশেষ অনন্ত মুহূর্তে তাঁর কার্য সম্পন্ন হয় :

The Poet's Work is Done······
Within a Moment.

শেলিও অলৌকিক প্রেরণাতে আস্থাবান :

"Poetry is indeed something divine······A man cannot say, 'I will compose poetry.' The greatest poet even cannot say it ;

for the mind in creation is as a fading coal, which some invisible influence, like an inconstant wind, awakens to transitory brightness ; this power arises from within······and the conscious portions of our natures are unprophetic either of its approach or of its departure"—(A Defence of Poetry).

এক আনন্দময় দিব্যভাবের আবেশে কিভাবে ইন্দ্রিয়চেতনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় ওআর্ডসওআর্থ তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন 'টিনটার্ন অ্যাবি'র কয়েকটি চরণে :

We are laid asleep
In body, and become a living soul.

এ যে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অন্যত্র তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় :

There was a time in my life when I had to push against something that resisted, to be sure that there was anything outside of me. I was sure of my own mind ; everything else fell away and vanished into thought.[8]

রবীন্দ্রনাথও দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, এবং তিনি এ বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তা আরো ব্যাপক ও গভীরতর :

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। (প্রভাত-সংগীত)

৪। 'Ode on Intimations of Immortality'র একটি চরণের সঙ্গে উক্তিটি তুলনীয় : Fallings from us, vanishings (১৪৩).

এই দিব্যদৃষ্টি বা ঐশী প্রেরণা সর্বপ্রথম প্লেটোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ডায়ালগ্‌স্‌'এ তিনি একে এক ধরনের 'উন্মত্ততা' আখ্যা দিয়েছেন :

The third kind is the madness of those who are possessed by the Muses ; this enters into a delicate and virgin soul, and the inspiring frenzy, awakens lyrical and all other numbers…the same man is nowhere at all when he enters into rivalry with the madman. (ফিডরাস)

'আয়ন'এ তাঁর মত আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সক্রেটিস আয়নকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে তিনি যে শক্তির অধিকারী তা কোনো শিল্পকলা নয়, একটা দৈব প্রেরণা তাঁকে চালিত করছে : 'There is a divinity moving you.' এখানে বক্রোক্তি থাকা অসম্ভব নয়, কারণ প্লেটো ছিলেন কাব্যবিরোধী, এবং পরে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিসম্প্রদায়কে নির্বাসিত করেছিলেন।[৫] তবে 'ডায়ালগ্‌স্‌'এ কবিদের উপর কটাক্ষপাত থাকলেও প্রকাশ্য নিন্দাবাদ নেই।

পরে প্রেরণাবাদ নিয়ে অনেক মতদ্বৈধের উদ্ভব হয়েছে, তবে নিরীশ্বরবাদী ছাড়া কেউ একে মতিভ্রম বলে উড়িয়ে দেন নি, এমন কি যাঁরা উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরাও কাব্যসৃষ্টির রহস্যময়তা স্বীকার করে নিয়েছেন। দিব্য প্রেরণা এই কাব্যরহস্যের একটা দিক হলেও এর একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যানের চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রেরণা আসে একটা শুভমুহূর্তে এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, এবং কার্যকারণ সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় তার কোনো চিহ্ন এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমরা বলি এটা অলৌকিক এবং রহস্যাবৃত। কিন্তু ঐ শুভ মুহূর্তটির আগে দীর্ঘকালব্যাপী যে কাব্যসাধনায় কবি আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রেরণালাভ সম্ভবত তারই প্রত্যক্ষ ফল। কোনো ভাব বা বিষয় হয়তো তাঁর মনে আনাগোনা করেছে কিন্তু ঠিক দানা বাঁধতে পারে নি, এখন হঠাৎ যেন তাঁর অন্তররশ্মিতে সব কিছু

৫। প্লেটোর 'রিপাবলিক' দ্রষ্টব্য।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যা নিরবয়ব ছিল তাই মূর্তি পরিগ্রহ করল। বাল্মীকি বা কালিদাসের কবিত্বশক্তিলাভের জনশ্রুতি সত্য বলে মেনে নিলে কিন্তু এ ব্যাখ্যা অচল হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলেন তাঁর কাব্যজীবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ যখন তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিমাণ ছিল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং প্রেরণারহস্য যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায় সেটা স্বীকার করে নেওয়াই সমীচীন।

আধুনিক মনোবিদ্যা প্রেরণাতত্ত্ব তথা কবির মানসক্রিয়ার উপর কিছুটা আলোকপাত করেছে। কবিরা মনোবিজ্ঞানীদের পূর্বসূরিরূপে বন্দিত হয়েছেন, কারণ আমাদের দৈনন্দিন সজ্ঞান জীবনের বাইরে যে আর একটা স্বতন্ত্র জগৎ আছে যা আমাদের চেতন মনের অগোচর—এ সত্য কবিরাই প্রথমে উপলব্ধি করেন।[৬] পরে মনোবিদ্যায় এই উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফ্রয়েড, ইউং প্রভৃতি মনোবিদের মতে নির্জ্ঞান মনোজগৎ কাব্যের উৎপত্তিস্থল। এই মত অনুসারে প্রেরণাকে বলা যায় নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া। যাঁরা মনঃসমীক্ষণে বিশ্বাসী তাঁরা আবার প্রেরণার সঙ্গে স্বপ্ন ও স্মৃতিকে যুক্ত করে ঐ প্রাচীন তত্ত্বটিকে যুক্তিভিত্তিক করার চেষ্টা করেছেন। স্বপ্নের সাহিত্যিক মূল্য আদিম যুগেও স্বীকৃত হয়েছে, তবে তখন স্বপ্ন ছিল দৈবপ্রেরণার নামান্তর মাত্র। এই প্রাচীন বিশ্বাসের পুনরভিব্যক্তি দেখা যায় মিলটনের একটি উক্তিতে—'For God is also in sleep and dreams advise.' ঈশ্বর স্বপ্নেও বিরাজ করেন কিনা এ নিয়ে

৬। In the dark recesses of memory, in unbidden suggestions, in trains of thought unwittingly pursued, in multiplied waves and currents all at once flashing and rushing in dreams that cannot be laid, in the nightly rising of the somnambulist, in the clairvoyance of passion, in the force of instinct, in the obscure but certain intuitions of spiritual life, we have glimpses of a great tide of life, ebbing and flowing, rippling and rolling and beating about where we cannot see it.—E. S. Dallas (জন প্রেসের 'Fire and the Fountain'এ উদ্ধৃত)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু প্রেরণাউদ্ভূত কবিতার চেয়ে স্বপ্নলব্ধ কবিতার সংখ্যা যে কম নয় তা পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ' ('সোনার তরী') কবিতাটির কাহিনী স্বপ্নলব্ধ, এবং অন্য কয়েকটি কবিতাতেও যেন স্বপ্নের মায়াজাল বিস্তার করা হয়েছে—যেমন 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা'তে। প্রসঙ্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বপ্নলব্ধ কবিতা হিসাবে কোলরিজের 'কুবলা খাঁ' সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত। এর মনোবিশ্লেষণসম্মত ব্যাখ্যা কতকটা এই রকম: কোলরিজ যেসব বই পড়েছিলেন সেগুলির কয়েকটি ঘটনা তাঁর নির্জ্ঞান মনে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সজ্ঞান মনের কাছে তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। স্বপ্ন যখন তাঁর নির্জ্ঞান মনকে বিক্ষুব্ধ করলে তখন যেন আকস্মিকভাবে বিস্মৃত সুরেব রেশ তাঁর কানে বেজে উঠল। ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ তিনি স্বপ্নেব ঘোবে ছিলেন ততক্ষণ তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করলেন। কিন্তু সমাপ্তিব আগেই জাগ্রত চেতনা এসে তাঁর নির্জ্ঞান মনকে গ্রাস করলে, কবিতাটি সেইজন্য অসমাপ্তই বয়ে গেল। এখানে দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো সময় কবি নির্জ্ঞান অবস্থায় যা পারেন সজ্ঞান অবস্থায় তাই তাঁর সাধ্যের বাইরে চলে যায়।

কবিচিত্তে স্মৃতির প্রভাব যে খুব ব্যাপক এবং স্মৃতিমন্থনের ফলে যে কাব্যামৃতের সমুদ্ভব হয়—এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত বললে অত্যুক্তি হবে না। বস্তুত মানুষের মন যেন স্মৃতিব অতলস্পর্শ সমুদ্রবিশেষ। বহুবিধ অতীত অভিজ্ঞতাব ছায়ামূর্তি সেখানে লুকিয়ে থাকে এবং সেগুলি হঠাৎ যখন কোনো কারণে উপরে ভেসে উঠে কবির মানস সত্তাকে বিচলিত করে তখনই মনে জাগে সৃজনের আবেগ। কারণটি সব সময়ে সহজনির্ণেয় নয়, তবে কখনও কখনও দেখা যায় ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের কোনো বস্তু—যা কবির মনে কম্পনের সৃষ্টি করে—সুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়, এবং স্মৃতির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে যেন কবির

কবিত্বশক্তিও জেগে ওঠে।[৭] জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে বর্তমান মুহূর্তের অনুভূতির সঙ্গে মিলেছে লেখকের প্রাচীন ভারতের সঙ্গে পরিচয়ের (যা সম্ভব হয়েছে শিল্প ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে) স্মৃতি। কোথায় বনলতা সেনের নাটোর আর কোথায় সিংহল, মধ্যরাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন মালয় সাগর, বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর :

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা—
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

মনের এই যে সৃজনক্ষম অবস্থা একেই প্রেরণা বলা চলে, এবং যেহেতু এর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না, সেইজন্য 'ঐশী', 'দিব্য', 'অলৌকিক' প্রভৃতি গুণনির্দেশক শব্দ এক্ষেত্রে ঠিক অপ্রযোজ্য বা বিভ্রান্তিকর নয়।

কবির সৃজনক্রিয়া, কবিতার অখণ্ডতা

কবিতা যে ভাবের প্রকাশ সে কথা আমরা আগেই বলেছি। কোনো কোনো কবিতা একটিমাত্র ভাবের দ্যোতক, যেমন 'নৈবেদ্যে'র অন্তর্ভুক্ত 'মুক্তি' কবিতাটির মূলভাব প্রথম চরণেই ব্যক্ত হয়েছে : বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। বাকী অংশ এই ভাবেরই সম্প্রসারণ। কবিতাটির পরিসর অত্যন্ত অল্প, কিন্তু ভাবগত ঐক্য তার উপর নির্ভর করে না। যেমন 'নৈবেদ্যে'রই আর একটি কবিতা 'জনারণ্যে' দুটি ভাবধারার মিলন ঘটেছে —একদিকে দেখানো হয়েছে রাজপথে উচ্ছলিত জনস্রোত, অপর দিকে

মহাজনারণ্যমাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি।

ভাব দুটি স্পষ্টত পরস্পরবিরোধী, কিন্তু এই বিরোধই মূল ভাবকে পুষ্ট ও প্রাঞ্জল করেছে, এবং পাঠকের চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা জনারণ্য নয়, 'সঙ্গবিহীন' দেবতার 'নিঃশব্দ সভা'।

৭। ওআর্ডসওআর্থের 'To the Cuckoo' দ্রষ্টব্য।

সর্বত্রই যে এই বিরোধ থাকবে এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, তবে প্রায়ই দেখা যায় অনুভূতি ঠিক এককভাবে কবির চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায় না। জলে ঢিল পড়লে যেমন আবর্তের পর আবর্ত দেখা দেয় তেমনি বিষয়সঞ্জাত একটি আবেগ থেকে অন্য আবেগের সঞ্চার হয়। এই সমস্ত আবেগ কবিতার উপাদান, এবং এগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও বিসদৃশ। নির্বিচারে কবি সবকিছু গ্রহণ করতে পারেন না, পরিবর্জন-ও নির্বাচন-ক্রিয়া এখানে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কাব্যের যা বিষয়বস্তু হতে পারে শুধু তাই বেছে নিয়ে বাকী সব তিনি বর্জন করেন। এ কাজে তাঁর প্রধান সহায় কল্পনা। কল্পনাদৃষ্টিতে তিনি বিষয়টির ভাবঘন রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এবং সেই কারণে তাঁর বাছাই কাজ খুব কষ্টসাধ্য হয় না। কিন্তু শুধু কল্পনার সাহায্যে তিনি অভীষ্ট লাভ করতে পারেন না, আংশিকভাবে তাঁকে বুদ্ধিবৃত্তিরও আশ্রয় নিতে হয়। এক কথায় নির্বাচনক্রিয়া অন্তত অংশত যুক্তিনির্ভর সজ্ঞান প্রয়াসের ফল।

কাব্যরচনার পরবর্তী পর্ব বিষয়বস্তুর যথাযথ রূপায়ণ। এখানে কবির একমাত্র লক্ষ্য: বিভিন্ন—এবং আগে যা বলা হয়েছে, অনেক সময় বিসদৃশ—উপাদানের একীকরণ। ঠিক কিভাবে কবি এ কাজ সম্পন্ন করেন তার রহস্য আজও সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। প্রসঙ্গত ক্রোচের প্রকাশবাদের কথা এসে পড়ে, কিন্তু তাঁর অভিমত সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য মনে হয় না। তিনি যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্তসার এইভাবে দেওয়া যেতে পারে: বহির্বিশ্বের কোনো বস্তু যখন কবিকে বিচলিত করে তখন তাঁর হৃদয়ে কতকগুলি সংবেদনের (sensation) সঞ্চার হয়। সাধারণ লোকের সংবেদনশীলতা অপেক্ষাকৃত কম হলেও কোনো মহৎ দৃশ্য—যেমন তরঙ্গায়িত বিরাট সমুদ্র বা তুষারমৌলি পর্বতশিখর, কিংবা কোনো মর্মস্পর্শী ঘটনা—দেখলে তাদের মনও একাধিক সংবেদনের পীড়নে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু এগুলি বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল ও নিরাকার অবস্থায় থাকে। 'সুন্দর', 'অপূর্ব', 'করুণ' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা তারা মনোভাব

প্রকাশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু 'প্রকাশ' কথাটাই এখানে অর্থহীন। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনাই প্রকাশের মূল কথা। কবিরও প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অনেকটা অসংহত। পরে তাঁর মনে জাগে স্বজ্ঞা (intuition) এবং তখন যা আকারহীন তাই আকার ধারণ করে, এবং ক্রোচের ভাষায় সজ্ঞান স্তরে এসে বস্তুতে পরিণত হয়, 'objectified in consciousness'. স্বজ্ঞালাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যেই সমস্ত উপাদান ঐক্যবদ্ধ হয়ে অখণ্ডরূপে প্রকাশ লাভ করে। লিপিবদ্ধ আকারে আমরা যা পাই তা আগেই প্রকাশিত বিষয়বস্তুর প্রতিরূপ মাত্র। কবিকর্মে স্বজ্ঞার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু এইটিই একমাত্র নিয়ামক এবং কাব্যরচনায় বুদ্ধিবৃত্তি চালনার কোনো অবকাশ নেই—এরূপ অভিমত কোনদিক দিয়েই সর্ববাদিসম্মত হতে পারে না।

বিভিন্ন উপাদানের একীকরণ কাব্যের প্রাণস্বরূপ। সম্ভবত প্লেটোই সর্বপ্রথম শিল্পগত ঐক্যের প্রতি অবহিত হন। প্রাণিদেহের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে সম্পর্ক এর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ঠিক সেই সম্পর্ক, অর্থাৎ জৈব সত্তার মধ্যে যে অখণ্ডতা আছে, শিল্পরচনাতেও তাই থাকা দরকার।[৮] পরে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দিক থেকে এই প্রসঙ্গের আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক সার্থক কবিতা যে জৈবসত্তার গুণসমন্বিত এ বিষয়ে কোনো মতভেদ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। কবিতার বিভিন্ন অংশ কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে তার একটা আভাস দেওয়া যেতে পারে।

কিটসের 'ওড টু নাইটিঙ্গেল'এ দেখতে পাই কবির সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে পাখির আনন্দময় মৃত্যুহীন সত্তার উপর : Thou wast not born for death, immortal Bird, এবং এই ভাবটির পটভূমিরূপে অঙ্কিত হয়েছে মনুষ্যজীবনের দুঃখ, বিড়ম্বনা ও নশ্বরতা। কল্পনাশক্তিকে বাহন করে তিনি বিহঙ্গের অরণ্যজগতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন এবং সাময়িকভাবে বর্তমান বাস্তব জগৎ তাঁর

৮। প্লেটো : Dialogues : Phaedrus.

চোখের সামনে থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 'এড়াইয়া কালের প্রহরী' তিনি যেন অতীতের সঙ্গে একাত্মা হয়ে গেছেন। যে গান আজ তাঁর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করেছে বাইবেলের যুগে সেই গানই প্রবাসিনী রুথের হৃদয়তন্ত্রীতে, আঘাত দিয়েছিল এবং পরিত্যক্ত পরীরাজ্যের সমুদ্রতীরস্থ কারাকক্ষে বন্দিনী নারীর কানে মধু বর্ষণ করেছিল। কিন্তু পরিত্যক্ত, 'forlorn' কথাটি তাঁকে আবার বাস্তব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনটি প্রধান অনুভূতি এখানে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। প্রথমে প্রকাশ পেয়েছে একটা আচ্ছন্ন ভাব, কিন্তু এখনও কবি পাখির আনন্দ ও মানুষের দুঃখ—দুইই সমমাত্রায় অনুভব করছেন। পরে পাখির আনন্দে তাঁর দুঃখবোধ বিলীন হয়ে গেল। শেষে যেন একটা ধাক্কা খেয়ে তিনি তাঁর স্বাভাবিক সম্বিৎ অর্থাৎ দুঃখবোধ ফিরে পেলেন। প্রথম ও শেষ অনুভূতি মোটামুটি একই সুরে বাঁধা, কিন্তু কবিতার মর্মস্থল নাইটিঙ্গেলের কালজয়ী আনন্দ। আনন্দের মধ্যে দুঃখের বিলুপ্তি নিঃসন্দেহে সুরসংগতির সৃষ্টি করেছে, কিন্তু দুঃখের পুনরভিব্যক্তিতে কি সে সংগতির ব্যত্যয় ঘটেছে? তার উত্তরে বলা যায়, বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তনের পরেও কবি যেন স্বপ্ন ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা জায়গায় আছেন—Do I wake or sleep? অর্থাৎ যে আনন্দময় চৈতন্য জাগ্রত হয়েছে তা এখনও লোপ পায় নি। তা ছাড়া নাইটিঙ্গেলকে সৌন্দর্যের প্রতীক মনে করলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হবে না। কিটসের নিজস্ব উক্তি[১] অনুসারে পাখিটি এখানে 'কল্পনাধৃত' মূর্ত সৌন্দর্য এবং সেইজন্য চিরন্তন সত্তা।

এইরূপ বিভিন্ন বস্তু সন্নিবিষ্ট হয়েছে অথচ বিরোধ না ঘটিয়ে মূল ভাবকে সমৃদ্ধ করেছে এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাটি। কবিতার সারমর্ম জীবনের গতিবেগ। প্রথমেই যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতেই কবিতার সুর অস্পষ্টভাবে

১। 'What the Imagination seizes as Beauty must be Truth'.

ধ্বনিত হয়েছে। ঝিলমের বাঁকা স্রোত গতিশীল, রাত্রির অন্ধকারও আসে নদীর জোয়ারের মতো, এমন কি নিশ্চল দেওদার তরু দেখেও কবির মনে হল, 'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে'। এর পরেই হংসবলাকা 'শব্দের বিদ্যুৎছটা' বিকীর্ণ করে আকাশপথে ধাবমান হল, এবং তার

এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

'শাজাহানে' কিন্তু বিরোধ আছে—সম্রাটের সীমাবদ্ধ খণ্ডিত জীবন এবং অনন্ত অখণ্ড জীবনের মধ্যে, এবং আমাদের সন্দেহ হয়, এ বিরোধ যেন সম্পূর্ণরূপে অবসিত হয় নি। যে শা-জাহানের

নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে

তাঁকে কবি যতটা প্রাধান্য দিয়েছেন প্রায় ততটা প্রাধান্য দিয়েছেন শিল্পী ও প্রেমিক শা-জাহানকে। দুটি বিপরীত ভাবের একত্র অবস্থান কবিতাতে মোটেই অস্বাভাবিক নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ নারীর দুইটি রূপ দেখিয়েছেন 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাটিতে। এখানে এই দুইয়ের সমাবেশে নারীচরিত্রের বৈচিত্র্য ও সমগ্রতা—যা কবিতার ভাবার্থ—ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'শা-সাজাহানে'র মূলভাব জীবনের গতিশীলতা, আনন্ত্য ও সর্বব্যাপিত্ব এবং কবিতার শেষ অংশ এই ভাবেরই অনবদ্য বিগ্রহ হলেও প্রথম অংশও স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশে এর বিলোপ ঘটে নি। কবিতার দুটি ভাগই অপূর্ব কাব্য কিন্তু তাদের মধ্যে শিল্পসম্মত পরিপূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হয় নি।

কল্পনা

কল্পনাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা কবি বিভিন্ন উপাদান একীভূত করেন, এ মত বেশ প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে, সুতরাং বিষয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'কল্পনা' শব্দটির সাধারণ অর্থ মনগড়া বিষয়, কিন্তু কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে এই অর্থ সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। এক্ষেত্রে আমরা কল্পনা বলতে বুঝি কবির সৃজনক্ষমতা। কাব্যগত ঐক্য ও সৌন্দর্য এরই উপরে নির্ভর করে, আবার কল্পনার জাদুদণ্ডস্পর্শে অতীন্দ্রিয় সত্তা প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে অতীত ভারত[১০] এবং কোলরিজের কাছে অতিপ্রাকৃত জগৎ[১১] এইরূপ প্রত্যক্ষ সত্য। যা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত নয় বা যা স্পষ্টত অবাস্তব[১২] তা কাব্যের বিষয়ীভূত হতে পারে কিনা এ নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তরে বলা যায়, বাস্তব সত্যের চেয়ে বৃহত্তর একটা সত্য আছে যা শিল্পীদেরই অনুভবগম্য, এবং আমাদের স্থূল দৃষ্টি তার বহিরাবণ ভেদ করতে পারে না বলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা ঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না।

কবিকল্পনা নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু ব্যাখ্যার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সূত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। ইংরেজী সাহিত্য-জগতে কোলরিজের কল্পনাতত্ত্বই বোধ হয় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ, তবে সম্পূর্ণ রোমাণ্টিক পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বটি আলোচিত হয়েছে বলে এরও আবেদন খুব ব্যাপক নয়। ক্যাণ্ট ও শিলিংএর অনুসরণে তিনি দ্বিবিধ কল্পনার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন—মৌল বা আদিম (primary) কল্পনা এবং কবিকল্পনা যা উদ্ভূত হয়েছে প্রথমটি থেকে (secondary)। মানুষের সমস্ত উপলব্ধির মূলে আছে

১০। 'কল্পনা' 'কথা' ও 'নৈবেদ্য' দ্রষ্টব্য।

১১। 'দা এনসিয়েণ্ট মেরিনার' ও 'ক্রিস্টাবেল' দ্রষ্টব্য।

১২। নাটকীয় আবেগ সঞ্চারের দ্বারা কোলরিজ অবাস্তবকেই বাস্তবের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

আদিম কল্পনা। এই উপলব্ধি ক্রোচের অস্ফুট 'সংবেদন' নয়, এ সৃজনক্রিয়ারই সগোত্র : 'a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I AM'।[১৩] কথাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করে মোটামুটি বলা যায় যে মানুষের সান্ত মনে যেন অনন্ত সৃজনলীলার পুনরাবৃত্তি চলেছে, কিন্তু সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তি এখানে নিষ্ক্রিয় কিংবা অবর্তমান। পক্ষান্তরে, কবিকল্পনা এই সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রাথমিক উপলব্ধিকে কাব্যরূপ দান করে। পরস্পরবিরোধী বিষয়সমূহের সামঞ্জস্যবিধান এর প্রধান বৈশিষ্ট্য :

Imagination···reveals itself in the balance or reconciliation of opposite or discordant qualities ; of sameness, with difference ; of the general with the concrete ; the idea, with the image ; the individual, with the representation ; the sense of novelty and freshness, with old and familiar objects ; a more than usual state of emotion, with more than usual order ; judgment ever awake and steady self-possession, with enthusiasm and feeling profound or vehement [১৪]

কল্পনার ধর্ম (function) কি কোলরিজ এখানে তাই বললেন, কিন্তু ঠিক কিভাবে সেই ধর্ম পালিত হয় সে বিষয়ে তিনি নীরব। পরস্পরবিরোধী বিষয়সমূহের সমন্বয় সাধন না হলে যে কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। কোলরিজের বক্তব্য থেকে এখন শুধু সেইটুকু জানা গেল যে ঐ সমন্বয় সাধিত হয় কল্পনার দ্বারা, কিন্তু তাতে মূল প্রশ্নটির কোনো মীমাংসা হল না। কর্তার (এবং কল্পনাই যে সর্বময় কর্তা তার প্রমাণ কি ?) সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলেও ক্রিয়াপদ্ধতির আদিঅন্ত আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে গেল। বস্তুত কাব্যপরিক্রমায় কোলরিজের কল্পনাতত্ত্ব (তাঁর অন্যান্য অভিমত এখানে বিচার্য নয়) খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। জার্মান তুরীয় (transcendental) দর্শন

১৩। 'বায়গ্র্যাফিয়া লিটারারিয়া'।
১৪। বায়গ্র্যাফিয়া লিটারারিয়া।

এবং রোমান্টিক সর্বেশ্বরবাদের (pantheism) প্রভাবে তিনি তাত্ত্বিকতাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ কাব্যালোচনার নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেন নি। অবশ্য তত্ত্ববিশেষের আবেগময় অভিব্যক্তি কাব্যকে গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কবির অনুভূতিই মুখ্য আকর্ষণ, তত্ত্ব নয়। যেমন, উল্লিখিত সর্বেশ্বরবাদের মূল ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে কোলরিজের 'এওলিয়ন হার্প'এ, ওআর্ডসওআর্থের 'টিনটার্ন অ্যাবি'তে (The presence 'whose dwelling is the light of setting suns···and in the 'mind of man') এবং রবীন্দ্রনাথের 'মানস সুন্দরী'র কয়েকটি চরণে :

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল, উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে
ললিত যৌবনখানি।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবি এখানে একাত্মা হয়ে গেছেন, কিন্তু যে শক্তির সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে তাকে যদি আমরা কল্পনা বলি (দিব্য প্রেরণা বললেও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না) তা হলে আমরা তার নামকরণ করেই কর্তব্য সমাধা করি, কল্পনাশক্তির সম্যক পরিচয় দানের সমস্যাটা এড়িয়ে চলি। কোলরিজও ঠিক তাই করেছেন, অর্থাৎ কবির মানসক্রিয়ার রহস্যোদ্ঘাটনে সমর্থ হন নি।

কবিতার ভাব, ভাবের প্রকাশ কবির ব্যক্তিত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকতা কাব্য ও জীবন

কবিতা যদি হৃদয়াবেগের প্রকাশ হয় তা হলে এ আবেগের প্রকৃতি কি সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। প্রাত্যহিক জীবনে প্রতি মুহূর্তে মানুষের হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে হর্ষ, শোক, ঘৃণা, প্রেম, হতাশা প্রভৃতি আবেগের দ্বারা। কিন্তু কাব্যে যখন এই সব আবেগ প্রকাশিত হয়

তখন তাদের বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটে। রূপান্তর যে ঘটে তার একটা মস্ত বড় প্রমাণ এই যে শোকের কবিতাও আমাদের আনন্দ দান করে। এটা কি করে সম্ভব হয়, আমাদের রসতত্ত্বে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের মনে সাধারণত যে সব ভাব জাগে রসতত্ত্বের ভাষায় সেগুলি লৌকিক ভাব। কবি যখন কোনো লৌকিক ভাব অবলম্বন করে তাকে কাব্যে রূপায়িত করেন তখনই তা অলৌকিক রসে পরিণত হয়, অর্থাৎ যা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত এখন তা সার্বভৌমত্ব অর্জন করে।

অন্যভাবে এখানেও কবির প্রকাশক্ষমতার কথা এসে পড়ে। এ বিষয়ে আমরা আগে যা বলেছি তাই একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, কবিকর্মের পর্ব মোটামুটি তিনটি—ব্যবহারিক জীবনে কোনো ভাব বা অনুভূতির উন্মেষ, কবিচিত্তে তার অনুপ্রবেশ এবং পরিশেষে কাব্যে তার প্রকাশ। সাধারণ অনুভূতি এবং কাব্যে প্রকাশিত অনুভূতি—এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে। রাসায়নিক যেমন কোনো মৌলিক পদার্থ মুষাতে (crucible) গলিয়ে অন্য কিছুর সংমিশ্রণে ভিন্ন বস্তুতে পরিণত করেন, তেমনি কবি যেন তাঁর মনের মুষাতে লৌকিক অনুভূতিকে দ্রবীভূত করে এবং আনুষঙ্গিক অন্য আবেগের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে রসে রূপান্তরিত করেন। তাঁর প্রাথমিক আবেগ মুখ্যত আত্মগত, এ বিহ্বলতার সৃষ্টি করে, এবং ঠিক এই অবস্থায় কাব্যরচনা নাও সম্ভব হতে পারে। পরে তাঁর মনে আসে আপেক্ষিক নির্লিপ্ততা। তিনি আবেগময় অবস্থার মধ্যে থেকেও নিজেকে যেন একটু দূরে সরিয়ে আনেন, এবং এই রূপে যখন মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসে তখন শুরু হয় আসল কাব্যরচনা।

এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় ওআর্ডসওআর্থের একটি বাক্যে—Poetry 'takes its origin in emotion recollected in tranquillity,'[১৫] প্রশান্ত আবেগের যে স্মৃতি জাগে তাই

১৫। Preface to the second edition of 'Lyrical Ballads.'

থেকে কাব্যের উদ্ভব হয়[১৬]—এবং 'টিনটার্ন অ্যাবি'র কয়েকটি চরণে :

> I have owed to them (প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী)
> In hours of weariness, sensations sweet
> Felt in the blood, felt along the heart ;
> And passing even into my purer mind
> With tranquil restoration.

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যদর্শনে যে সংবেদনের (sensation) সঞ্চার হয়—প্রথমে সেটি যেন দেহাশ্রয়ী, তাতে রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে (felt in the blood), পরে তা স্থানান্তরিত হয় হৃদয়ে (felt along the heart) এবং সেখান থেকে শুদ্ধতর মনে (purer mind)। মনের এই শান্ত, সমাহিত অবস্থা কাব্যসৃষ্টির উপযোগী। স্মৃতির স্নিগ্ধ আলোকসম্পাত না হলে যে হৃদয়াবেগ কাব্যরসে পরিণত হয় না 'জীবনস্মৃতি'তে[১৭] রবীন্দ্রনাথও এইরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অনুভূতির উদ্ভব এবং প্রকাশ—এ দুইয়ের যুগপত্তারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।[১৮] সুতরাং প্রাথমিক উত্তেজনার অবসান না ঘটলে কাব্যরচনা সম্ভব নয় এ কথা সব জায়গায় প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে আবেগ যেখানে অত্যন্ত তীব্র—যেমন শোকাবেগ—সেখানে আবার ওআর্ডসওআর্থ-কথিত প্রশান্তি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

'দে সেক্রেড উড'-এ টি. এস. এলিয়ট ওয়ার্ডসওআর্থের মত খণ্ডন করে বলেছেন যে, কবিতা আবেগ থেকে উদ্ভূত হয় না, আবেগের স্মৃতি থেকেও নয়, এবং অর্থকে বিকৃত না করলে 'প্রশান্তি' শব্দটিও অব্যবহার্য। কাব্যের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'It is a concentration, and a new thing—resulting from a very great number of experiences which to the

---

১৬। প্রথম অধ্যায় ৩ দ্রষ্টব্য।

১৭। 'কারোয়ার'।

১৮। নাইটিঙ্গেলের গান শুনতে শুনতেই কিটস তাঁর বিখ্যাত 'ওড'টি রচনা করেন।

practical and active person could not seem to be experiences at all. ওআর্ডসওআর্থ কিন্তু কেন্দ্রীভবন (concentration) কথাটি প্রয়োগ না করলেও প্রশান্তিকে কাব্যরচনার শেষ স্তর মনে করেন নি। প্রিফেসেই তিনি বলেছেন যে প্রশান্ত-চিত্তে কবি শুধু স্মৃতিটুকু নিয়ে বসে থাকেন না, তিনি এর মননও করেন এবং মননের ফলে ধীরে ধীরে আর-একটা আবেগের উদ্রেক হয় যা প্রাথমিক আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত (kindred)।

এই অন্তিম আবেগ থেকে উদ্ভূত হয় একটা নূতন জিনিস যাকে আমরা বলি কবিতা এবং যা একটি বিশেষ ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি হলেও সর্বসাধারণের সামগ্রী। কিন্তু ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি বলেই প্রত্যেক শিল্পকর্মের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন সব সময় জড়িত থাকে। সেই জন্যে দেখা যায়, একই বিষয় বিভিন্ন কবির হাতে পড়ে তাই ভিন্ন রূপ ধারণ করে, এমন কি একই কবি যদি বিভিন্ন সময়ে একই বস্তুকে কাব্যের বিষয়ীভূত করেন তাহলে সেখানে দেখা যাবে একটি কবিতার সঙ্গে অপরটির মিল নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নীলকণ্ঠ', বুদ্ধদেব বসুর 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা'র মধ্যে বিষয়গত ঐক্য রয়েছে, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে প্রত্যেকটি কবিতা স্বতন্ত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আঁধার-বরণ' আফ্রিকার জন্ম 'সূর্যের ঔরসে মহারণ্যের গর্ভে' এবং

কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

আর বুদ্ধদেব বসুর 'ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকা'র

শীর্ণ ছায়া শুষে নিল আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য।

রবীন্দ্রনাথও আফ্রিকাতে দেখেছেন

সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা। (আফ্রিকা)

কিন্তু সভ্যতার এই 'অন্তিমকালে'ও তিনি স্বস্তিবচন উচ্চারণ করেছেন, যুগান্তরের কবিকে আহ্বান করে বলেছেন

দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে।
বল 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

একই কবি যে বস্তুবিশেষের দ্বারা ভিন্নভাবে উদ্দীপিত হতে পারেন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' ('মানসী') ও 'যক্ষ' ('সানাই')।

কবির ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে তাঁর রচনার এই নিবিড় সংযোগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে রচয়িতার ব্যক্তিত্বই যদি কবিতার যথাসর্বস্ব হত তাহলে তার আবেদন কখনো সর্বজনীন ও সর্বকালীন হতে পারত না। আসলে, কবি যতটা আত্মলীন ঠিক ততটাই নৈর্ব্যক্তিক। কোনো এক কৃষ্ণা নারীর বিশ্বাসঘাতকতা শেক্সপিয়রের মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, সেটা নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু যে কয়েকটি সনেটে তাঁর চিত্তবিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিতে শুধু একজন বিশেষ ব্যক্তি শেক্সপিয়রের নয়, প্রত্যেক ব্যর্থ-প্রণয়ীরই হৃৎস্পন্দন শোনা যায়। শেক্সপিয়র যেন নিজেকে 'বিশ্বময় ছড়ায়ে' দিয়ে নিখিল হৃদয়ের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে পেরেছেন। এবং সেই কারণেই তাঁর কবিতাবলী রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

টি. ই. হিউম, এলিয়ট প্রমুখ আধুনিক সমালোচকেরা ব্যক্তিস্বরূপের প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তাঁদের মতে, রোমান্টিক কবিরা অত্যধিক মাত্রায় অন্তর্মুখীন বলে তাঁদের অনেক রচনা সার্থক হতে পারে নি।[১৭] যেখানে বাস্তবিকই কবি নিজের মনের অলিগলি

১৭। ভার্জিনিয়া উলফ কিন্তু এই মতের বিরোধিতা করেছেন। 'দে কমন রিডার'এর অন্তর্গত একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন যে আধুনিক লেখকেরাই নিজেদের মনের গহ্বর থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পান না। রোমান্টিক কবিদের একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল যে তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতি সর্বজনীন

ছেড়ে বাইরে কোথাও বেরুতে পারছেন না—যেমন শোল 'অ্যালাস্টারে'—সেখানে অবশ্য রসসৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। এইজাতীয় রচনা লেখকের ব্যাধিত (morbid) মনের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক কাব্যবিচারের মূল সূত্র অনুযায়ী রসসৃষ্টির মূলে আছে লেখকের নিরাসক্ত মনোভাব এবং নাটকীয়তা। শিল্পীর স্থান হওয়া উচিত নেপথ্যে, রচনার মধ্যে নয়। শিল্পকর্মে কি ভাবে নাটকীয় রীতি অনুসারে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা যেতে পারে এলিয়ট তার একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

"The only way of expressing emotion in art is by finding an 'objective correlative'; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that *particular* emotion; and that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked."[২০]

Objective correlative—'আবেগের সহিত সম্পর্কিত বস্তু'—কথাটি আজকাল খুব সুপ্রচলিত এবং চমকপ্রদও বটে, কিন্তু এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। এলিয়টের মতে, 'আবেগের সহিত সম্পর্কিত বস্তু' ভাবপ্রকাশের মাধ্যম, এবং এরই পিছনে কবি আত্মগোপন করে পাঠকের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদানপ্রদান করেন। কিন্তু কবিকে যদি এই বস্তু খুঁজে বার করতে ('finding') হয় তাহলে তো কাব্যপ্রয়াস এবং যান্ত্রিক প্রয়াসের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাকি এই অনুসন্ধানেরই ফল। নাটকটি যে বিশেষ অনুভূতির 'কোরিলেটিভ' সেটি আগেই তাঁর জানা ছিল, পরে তিনি যথাযোগ্য পরিস্থিতি বা ঘটনাবর্ত্ত আবিষ্কার করেছিলেন! এইভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিস্বরূপকে নাটক থেকে

অনুভূতি, এবং এই প্রত্যয়ের জোরেই তাঁরা ব্যক্তিত্বের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পেরেছিলেন।

২০। Selected Essays : *Hamlet.*

বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন। অন্যত্র[২১] এলিয়ট বলছেন, কবি প্রকাশ করেন তাঁর রচনারীতিকে (medium), ব্যক্তিত্বকে নয়। তাঁর ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে নানা রকম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে একত্র মিলিত হয়। যে সব অভিজ্ঞতা ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ কাব্যে তারা নাও স্থান পেতে পারে, আবার কাব্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সময় তাদের কোনো মূল্য থাকে না। কাব্যের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন যে আলাদা, এটা অত্যন্ত মোটা কথা। এবং এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। এখানে আসল প্রশ্ন, কবি কি প্রকাশ করেন—রচনারীতি না এর সাহায্যে তাঁর মনোভাব ? সম্ভবত এলিয়ট এখানে পরোক্ষভাবে কলারূপের (form) কথা বলতে চেয়েছেন। 'কার মেমোরিয়ল লেকচারে' তিনি বলেছেন, কবি যদি কোনো বিশেষ কলারূপ—যথা সনেট—বেছে নেন তাহলে তিনি রূপটিকে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সম্বন্ধ করেন : he makes the pattern comply with what he has to say। এবং বক্তব্য যদি থাকে তাহলে বক্তা থাকবে না কেন ? শিল্পগত আবেগ নৈর্ব্যক্তিক হলেও এ কথা বলা সংগত হবে না যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির কোনো সংযোগ নেই। কাব্যরচনাকালে এলিয়ট নিজেই মাঝে মাঝে তাঁর বিধান ভঙ্গ করেছেন বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing ;
wait without love
For love would be the love of the wrong thing ;
there is yet faith.
But the faith and the love and the hope are all in
the waiting ;
Wait without thought, for you are not ready
for thought.

এখানে কি কবির ব্যক্তিমানসের চিত্রটিই ফুটে ওঠে নি ?

২১। 'ট্র্যাডিশন অ্যাণ্ড দা ইনডিভিজুয়্যাল ট্যালেণ্ট।'

দ্বিধাবিভক্ত য়ুরোপীয় সমাজে মানুষের সত্তা আজ খণ্ডিত, সেইজন্য আধুনিক কাব্যে খণ্ড চৈতন্যের প্রকাশ অনিবার্য—ওআর্ডসওআর্থ কিংবা রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধ এখন যুগধর্মের দ্যোতক নয়—কিন্তু তাতে কাব্যের আসল প্রকৃতি বদলে যেতে পারে না। যা খণ্ডিত কাব্যে তা-ই অখণ্ডরূপে প্রকাশ পায়। বস্তুত জীবনে যা ঘটে তা সব সময়েই অপূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী, এবং সেইজন্য সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মায় না। কিন্তু সেইটিই যখন কাব্যে অখণ্ডতা লাভ করে তখন আমরা তার শাশ্বত, সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করি। জীবনের সব কিছুই 'কালস্রোতে ভেসে যায়', কিন্তু কাব্য যেন একটা বিশেষ মুহূর্তকে সেই স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে এনে তাকে নিত্যতা দান করে। প্রেম, মিলন, বিরহ, ঈর্ষা নিয়ে মানুষের মনে কতই ভাঙাগড়া চলেছে, কিন্তু সবই বুদ্বুদের মতো একবার ভেসে উঠে পরমুহূর্তেই কোথায় মিলিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, এই প্রণয়লীলাই যখন শিল্পে রূপায়িত হয় তখন তা অমরত্ব অর্জন করে। প্রাচীন গ্রীক ভস্মাধারে অঙ্কিত প্রেমিককে উপলক্ষ করে কিটস বলছেন যে চিরদিনের জন্য সে ভালোবাসবে এবং তার প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য কখনও ম্লান হবে না। লৌকিক জগতে ওদের প্রেমাভিনয় যতই স্বল্পায়ু হোক, শিল্পজগতে এর বিনাশ নেই।

গ্রীক অনুকৃতিবাদ

সুতরাং আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কাব্য জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনের আলোকচিত্র নয়। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক অনুকৃতিবাদের প্রশ্ন এখানে স্বতই এসে পড়ে। নিছক অনুকরণ অর্থে এ তত্ত্ব যে মূল্যহীন তা আমাদের পূর্ব আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। এর প্রথম অধিবক্তা প্লেটো কিন্তু ঠিক এই অর্থেই অনুকরণ (imitation) শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মতে প্রত্যেক পার্থিব বস্তু প্রতীয়মান সত্য মাত্র, পরম সত্য বস্তুটির ভাব (idea) যার স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বর। যেমন, আদর্শ শয্যা ঈশ্বরের সৃষ্টি, সূত্রধর এর

অনুকরণ করে, এবং ঐ অনুকৃত জিনিসের অনুকরণ করেন কবি বা চিত্রকর। অর্থাৎ শিল্পকর্মে সত্যের বিকৃতি ঘটে দ্বিতীয় দফায়।[২২] ভাববাদী প্লেটোর এই অত্যদ্ভুত যুক্তি অবশ্য কোনো শিল্পীই মেনে নেন নি, পরবর্তী গ্রীক সমালোচনাসাহিত্যে দেখা যায় 'অনুকরণ' (গ্রীক mimesis) শব্দটি পরিভাষারূপে গৃহীত হয়েছে। 'পোএটিক্‌স্'এ অ্যারিস্টটল স্পষ্টই বলেছেন যে কাব্যজগতের যারা অধিবাসী তারা সাধারণ নরনারীর চেয়ে হয় ভালো না হয় মন্দ, এবং কাব্যবর্ণিত ঘটনাবলীও বাস্তবানুগ নয়। "যদি আপত্তি করা হয় যে বর্ণনা সত্য নয় তাহলে কবি উত্তর দিতে পারেন, 'কিন্তু বিষয়গুলি যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক সেই ভাবে বর্ণিত হয়েছে', যেমন সফোক্লিস বলেছিলেন, 'মানবচরিত্র যেমন হওয়া উচিত ঠিক সেই ভাবে চিত্রিত হয়েছে।'" (পোয়েটিক্‌স্, ২৫)। কাব্য যে ইতিহাসের চেয়ে দার্শনিকভাবাপন্ন এবং কাব্যগত বিষয়বস্তুর আবেদন যে সর্বজনীন—এ বিষয়েও অ্যারিস্টটলের কোনো সংশয় ছিল না। মোট কথা, কাব্য অথবা ট্র্যাজেডি যে বাস্তবের প্রতিলিপি নয় অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সমস্ত কাব্যতত্ত্ববিৎ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।[২৩]

প্রতীকতা, কাব্যসংগীত, অর্থের গুরুত্ব কবিতা ও ধ্বনিঝংকার

গ্রীক অনুকৃতিবাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে প্রতীকতা, যদিও এর তাত্ত্বিক পরিণতি আমরা প্রথম দেখতে পাই উনিশ শতকের শেষে—বদলেয়ার, ম্যালার্মে, ভ্যালেরি প্রমুখ ফরাসী কবিদের শিল্পসমালোচনায়। আদিম মানবের অতিকথা (myth) ও কিংবদন্তী মুখ্যত প্রতীকধর্মী। এগুলি তার সমগ্র অভিজ্ঞতা তথা সমষ্টিগত চৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

২২। প্লেটো: রিপাবলিক, ১০।

২৩। 'অনুকৃতিবাদ' কথাটি প্রয়োগ না করলেও অন্য প্রসঙ্গে আমরা এর বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বিভাগ ৪, ৫, ৬ দ্রষ্টব্য।

কয়েকটি প্রতীকের পৌনঃপুন্য অতিকথার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইয়ুঙের ভাষায় এইগুলি 'রূপান্তরের আদিরূপ' ('the archetype of transformation'), যার সাহায্যে মানুষ তার দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিস্বরূপকে সমগ্রতা দান করতে পারে। ঐ রূপান্তর সাধনের একমাত্র উপায় হল বহিঃপ্রকৃতির কোনো বিরাট শক্তিকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির আধার রূপে কল্পনা করা, এবং এর দ্বারা মানুষ যেন আত্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেয়। ঋগ্বেদে এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও কাব্যে এইরূপ প্রতীকতার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়।[২৪]

ফরাসী প্রতীকীদের বিশেষত্ব এই যে তাঁরা প্রতীকের সাহায্যে কাব্যকে সংগীতের পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন। সংগীতের প্রধান লক্ষণ বাহুল্যহীনতা। ভাব, তান, ছন্দ ও লয়ের সমন্বয়ে যে সুরসংগতির সৃষ্টি হয় তাতে কলারূপ ও বিষয়বস্তু চরম ঐক্য লাভ করে। কিন্তু সুরসৃষ্টির দ্বারা যা সম্ভব চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী শব্দপ্রয়োগের দ্বারা তা কোনোমতেই সম্ভব হয় না। সুর কোনো রকম অর্থের দ্যোতক না হয়ে শুধু একটি আবেগের সঞ্চার করতে পারে। পক্ষান্তরে শব্দ- যা কবিতার ভিত্তিস্বরূপ—সব সময়ে অর্থাশ্রয়ী, কাব্যগত শব্দবিন্যাস আবেগের উদ্রেক করলেও অর্থ থেকে তাকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। ফরাসী প্রতীকবাদীরা এই অসাধ্য সাধনেরই চেষ্টা করেছিলেন। ম্যালার্মে বলতেন, কবিতা রচিত হয় শব্দ দিয়ে, ভাব (idea) দিয়ে নয়। এই উক্তিটি ফরাসী প্রতীকতার মূল সূত্র হিসাবে গৃহীত হতে পারে। ম্যালার্মে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে শব্দের শুধু একটা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা থাকবে—সে ব্যঞ্জনা অর্থের নয়, হৃদয়াবেগের। অর্থের ছোঁয়াচ লাগলেই শব্দটির জাতিভ্রংশ হবে। কবি এমনভাবে শব্দের পর শব্দ যোজনা করবেন যে তাঁব রচনায় মধ্যে কেবল একটা বিশেষ মানসিক অবস্থার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া

২৪। ঋগ্বেদে সবিতা, মিত্র এবং বরুণ যথাক্রমে জীবন, আলোক ও নীল আকাশের প্রতীক।

যাবে, কোনো কিছুর বিবরণ বা প্রতিরূপ দেওয়ার প্রয়াস এখানে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

কবিতায় যে নিছক বিবরণ অচল—এটা অত্যন্ত পুরানো কথা, কিন্তু ফরাসী কবিরা বর্ণনাত্মক ভঙ্গি পরিহার করে ব্যঞ্জনাকে এতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে ফেলেছেন যে ব্যঞ্জনাটা যে কিসের তা হৃদয়ংগম করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বস্তুত কবিতা কোনো ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অর্থ-নিরপেক্ষ হতে পারে না। ঐশী প্রেরণা, দিব্যোন্মাদ, নির্জ্ঞান মানস ক্রিয়া, প্রতীক, বা সংগীতধর্মিতা—যাই বলা হোক না কেন, অর্থকে বাদ দিয়ে আমরা কবিতার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি না। প্রত্যেক শব্দ, বাক্য, রূপকল্প ও ছন্দের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে—এবং সেটি ঠিকমত বুঝতে না পারলে রসোপলব্ধি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবিতার অর্থ অবশ্য অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর, কারণ বাচ্যার্থ এখানে সব নয়। এর অতিরিক্ত একটা অর্থ আছে যাকে বলা হয় ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি। কিন্তু বাচ্যার্থেরই পরিণতি ব্যঙ্গ্যার্থ, সুতরাং প্রথমটিকে উপেক্ষা করে আমরা দ্বিতীয়টিকে উপলব্ধি করতে পারি না। শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ কবিতায় অসম্ভব। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ভাষা প্রয়োগ করি তা অনেক সময় আমাদের মানসিক শৈথিল্যের পরিচায়ক, একটা শব্দ আমরা এক অর্থে ব্যবহার করি, অপরে সেটা অন্য অর্থে গ্রহণ করে। এবং তাতে কম অশান্তির সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ঐ একই শব্দ যদি কবিতায় স্থান পায় তা হলে এর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে শব্দটি বিশিষ্ট অর্থের বাহন হয়।[২৫]

২৫। তুলনীয়: The range of variety with a single word is very little restricted. But put it into a sentence and the variation is narrowed; put it into the context of a whole passage, and it is still further fixed; and let it occur in such an intricate whole as a poem and the responses of competent readers may have a similarity which only its occurrence in such a whole can secure. I. A. Richards: *Principles of Literary Criticism* P. 10

কাব্য বিচারের পক্ষে ঐ অর্থোপলব্ধি অত্যাবশ্যক। পাঠক তাঁর নিজের রুচি বা বুদ্ধি অনুসারে কবিতাবিশেষের খুশিমত একটা অর্থ আরোপ করতে পারেন, একথা অনেকের মুখে শোনা যায়।[২৬] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কদর্থ করার অধিকার কোনো পাঠকেরই থাকতে পারে না। অলংকারপ্রধান কবিতা (কাব্যজগতে এই ধরনের কবিতার স্থান অনেক নীচে) অবশ্য দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে, যেমন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদার আত্মপরিচয়', কিন্তু সেখানেও দুটি অর্থই স্পষ্ট বোধগম্য। মোট কথা অর্থ বা ভাবের ব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রাণ, এবং সেটি ঠিকমত গ্রহণ করা পাঠকের প্রধান কর্তব্য।

ফরাসী প্রতীকী কাব্য এবং আধুনিক কাব্যের (যা প্রতীকতার দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবিত) অপব্যাখ্যার জন্য অবশ্য পাঠকসমাজ সব সময়ে দায়ী নন। বদলেয়ার, ম্যালার্মে ও ভ্যালেরি এবং তাঁদের উত্তরসাধকেরা 'ধ্বনিপ্রধান গীতধর্ম'কেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ মনে করেন, এবং অর্থ তাঁদের কাছে কাব্যের উপজাত (by-product) মাত্র। এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি উক্তি স্মরণীয় :

The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him.' (*The Use of Poetry and the Use of Criticism*).

অর্থাৎ অর্থের সত্যকার কোনো মূল্য নেই, শুধু পাঠক এতে অভ্যস্ত বলে তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য একটু অর্থযোজনার প্রয়োজন হয়। পাঠক যখন সেই অর্থমহিমায় মুগ্ধ হয়ে থাকেন কবিতাটি তখন 'অন্য উপায়ে তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করে'। রিচার্ডসের ভাষায়, একটি উপায় সম্ভবত 'ভাব-সংগীতের' (music of ideas) সৃষ্টি।[২৭] এলিয়টের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে রিচার্ডস বলছেন,

---

২৬। রবীন্দ্রনাথও এই মতের সমর্থক ছিলেন, 'পঞ্চভূত : কাব্যের তাৎপর্য' দ্রষ্টব্য।

২৭। *Principles of Literary Criticism.*

ভাবসমূহের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সেগুলি বিন্যস্ত হয় সংগীতজ্ঞের কথার মতো এবং সেইজন্য আমরা কোনো কিছুর বিবরণ পাই না। শুধু আমাদের মন যেন বিচলিত হয়ে ওঠে, এবং আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়া একটা সমগ্র, সুসম্বদ্ধ মনোভাবে পরিণত হয়। অর্থাৎ সংগীতের মতো এইজাতীয় কবিতা আমাদের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-চালনা করার কোনো অবকাশ থাকে না। এলিয়টের 'ওএস্টল্যাণ্ড'কে —এর উদ্ধৃতি, উল্লেখ (allusion), ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের আধিক্য সত্ত্বেও—এই 'ভাব-সংগীতে'র মূর্ছনা বললে অতিশয়োক্তি হবে না। কবিতাটির তিনটি প্রধান ভাবধারা—অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান লণ্ডন, রণক্লান্ত ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপ এবং মানবীয় সভ্যতার সংকট—যেন সুরের তরঙ্গভঙ্গ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সুর তো এখানে নিরালম্ব নয়, সে ভাবেরই আশ্রিত এবং ভাব যখন স্বভাবতই অর্থসূচক তখন অর্থকে পাঠকের মন ভোলাবার উপায়মাত্র মনে করা নিশ্চয় অসংগত। অর্থের অস্পষ্টতা যে সংগীতের মাধুর্যহানি করতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এলিয়টেরই আর-একটি কবিতা—'অ্যাশ ওএনস্‌ডি'।

আবার সংগীত থেকে এক ধাপ নীচে নেমে এসে অনেকে ছন্দেব ধ্বনিমাহাত্ম্য কীর্তন করেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে ধ্বনিমাধুর্য অথবা গাম্ভীর্য কবিতার মুখ্য আকর্ষণ, অর্থপ্রকাশ গৌণ ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে 'ছন্দে, শব্দবিন্যাসের ও ধ্বনিঝংকারের তির্যক ভঙ্গিতে যে সংগীতরস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে…তার জবাবদিহি আছে'। (রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্যের স্বরূপ')।

এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তার বাষ্প এই গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে
স্মিত ওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন। (বিষ্ণু দে : 'জন্মাষ্টমী')

স্তবকটির শব্দগাম্ভীর্য বিস্ময়কর, কিন্তু এই গাম্ভীর্যের উৎপত্তি যে অর্থের গম্ভীরতায় সেটা যদি আমরা বিস্মৃত হই তা হলে কি শুধু 'ধ্বনিঝংকার' নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারব? বস্তুত ধ্বনিঝংকার সম্পূর্ণরূপে অর্থসাপেক্ষ এবং এ কথার যাথার্থ্য আমরা বুঝতে পারি প্যারডির সঙ্গে মূল কবিতার তুলনা করলে। রবীন্দ্রনাথের 'শরতে বঙ্গ' কবিতাটির অনুকরণে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন,

আজি কি মা তোর বিধুর মূরতি
হেরিনু শরৎ প্রভাতে,
হে মাত বঙ্গ, মলিন অঙ্গ
ভরি গেছে খানা ডোবাতে।
পাবে না বহিতে লোকে জ্বরভার
পেটে পেটে পিলে ধবে নাক আর
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
তোমার কানন-সভাতে।

ছন্দের কাঠামো এখানে অপরিবর্তিত, কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে, এবং তাই কবিতাটি হাস্যোদ্দীপক হয়েছে।[২৮]

ভাবসঞ্চারণ

এতক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কবির সৃজনক্রিয়ার প্রকৃতি ও পদ্ধতি। এখন আমরা দেখব কবির অন্তরস্থ ভাবধারা কি করে পাঠকের মনে প্রবাহিত হয়ে অন্তত সাময়িকভাবে কবি ও পাঠককে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ করে। ভাবের যথাযথ প্রকাশে কবিকর্মের চরিতার্থতা, কিন্তু কবিকর্ম পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে যখন এর অন্তর্নিহিত ভাবটি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়।

একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে;
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে। (রবীন্দ্রনাথ : 'গানভঙ্গ')

২৮। অবশ্য ছন্দের অনুকরণ করেও যদি কবি ভাবের গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন তাহলে আর তাঁর রচিত কবিতাকে আমরা প্যারডি বলব না, যেমন

গায়ক ও শ্রোতার অথবা কবি এবং পাঠকের এই 'সহিতত্বে'র (সাহিত্যের এইটিই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ) উপর কাব্যের চরম উৎকর্ষ নির্ভর করে। কবির প্রাথমিক প্রেরণা নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা, কিন্তু পরে দেখা যায় নিজেকে তিনি নিজের কাছেই প্রকাশ করেন না, অপরের কাছেও। মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির বশেই অপরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। প্রকাশের এই বাসনা জৈব-বৃত্তিরই একটা বিশেষ অঙ্গ। 'আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে-জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়। নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে। মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেইরকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে ও কালে।...মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে'। (রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য' : 'সাহিত্যের সামগ্রী'।[২৯]

পূর্বকালে এই অমরতালাভের প্রার্থনা প্রায় একটা প্রথায় পরিণত হয়েছিল, মধুসূদনও আশা করেছিলেন গৌড়জন 'নিরবধি' তাঁর কাব্যমধু পান করবেন। এখনকার কবি হয়তো এতখানি আশা পোষণ করেন না, তা হলেও তিনি এইটুকু কামনা করেন যে সমসাময়িক পাঠকসমাজ তাঁকে উপেক্ষা করবেন না। রচনাকালে

দ্বিজেন্দ্রলালের 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে'র অনুকরণে লেখা যতীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা, 'চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গে'।

২৯। 'পুরস্কারে' ('সোনার তরী') কবি আশা করছেন :

বিদায়ের আগে দুচারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

অবশ্য কবির প্রধান লক্ষ্য থাকে তাঁর ভাবের শিল্পসম্মত প্রকাশের দিকে। তাঁর রচনা পাঠকবর্গের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করবে, তাঁদের চিত্তজয় করতে পারবে কি না—এ-সব চিন্তা সাধারণত তাঁর মনের মধ্যে জাগে না। ভাবের প্রকাশের চেয়ে সঞ্চারণের দিকে বেশী মনোযোগ দিলে প্রকাশকার্যই ব্যাহত হতে পারে। এ কথা সব সময়ই স্মরণীয় যে প্রকাশ ও সঞ্চারণ দুটো পৃথক ক্রিয়া নয়। যা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় তা এমনিতেই পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়। পাঠকের কথা স্মরণ করে কোনো কবি যদি সব সময়ে ভাব-সঞ্চারণের প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তা হলে এ দুয়ের মধ্যে তিনি যেন একটা কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করেন। কাব্যরচনার সঙ্গে যে নির্জ্ঞান মন জড়িত থাকে সে কথা আমরা আগেই বলেছি, এবং কবি যখন সজ্ঞানভাবেও লেখেন তখন সৃজনক্রিয়া তাঁকে এত গভীরভাবে আবিষ্ট করে রাখে যে পাঠকের অস্তিত্বের কথা ভুলে যাওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। যিনি ভোলেন না তাঁর প্রকাশ- ও সঞ্চারণ-কার্য বিঘ্নিত হয়।[৩০]

প্রকাশ ও সঞ্চারের মধ্যে যখন কোনো মৌলিক ভেদ নেই, তখন এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে কবিতার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমবা লক্ষ্য করেছি তাদেব মধ্যেই কবির সংক্রামকশক্তি নিহিত রয়েছে। কবি সব কিছুই নূতন চোখে দেখেন এবং তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও পাঠকও যেন সেই দৃষ্টিশক্তি লাভ কবেন। তখন যা তুচ্ছ ও অর্থহীন তা-ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং যা তিনি দেখেও দেখেন নি তারই মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। রাত্রিতে ঘুম না হলে অনেক সময় পাখির ডাক শোনা যায়, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মতো আমরা কি কল্পনা করতে পারি—

৩০। শেক্সপিয়র এর ব্যতিক্রম। Richards : *Principles of Literary Criticism*, Chapter IV দ্রষ্টব্য।

সাগরের ওই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিলো ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে ! ('পাখিরা')

কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের চোখের সামনে থেকে যেন একটা কালো পর্দা সরে যায় এবং আমরা এক অদৃষ্টপূর্ব রহস্যলোকের সন্ধান পাই।

কবিতা যে এত গভীরভাবে আমাদের অভিভূত করে তার কারণ নিহিত আছে এর বিষয়বস্তুর মধ্যে। কয়েকটি শাশ্বত হৃদয়ভাবই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। যুগের পরিবর্তনে সমাজ তথা ব্যক্তি-চেতনা অনেক বদলে যায়, ভাববিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু ঐ বিন্যাসটুকু বাদ দিলে সব যুগেই দেখা যায় কবিতার সার বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রয়েছে। এ দিক দিয়ে কবি কোনো মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন না, কিন্তু প্রত্যেক চিরন্তন হৃদয়াবেগের বৈচিত্র্য এত অপরিসীম যে চর্বিতচর্বণ পরিহার করে তিনি একে সম্পূর্ণ নূতনরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কখনও কখনও মনে হয় একই সুর বিভিন্ন যুগে ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু ওরই মধ্যে বৈচিত্র্যেরও আভাস পাওয়া যায়। যথা বিদ্যাপতির

জনম জনম হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এবং রবীন্দ্রনাথের

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। ('অনন্ত প্রেম')

একই সুরে বাঁধা হলেও অভিন্ন নয়। বর্তমান যান্ত্রিক যুগ প্রেমাবেগ-প্রকাশের খুব অনুকূল নয়, তবুও বিদ্যাপতি-রবীন্দ্রনাথের

সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শাশ্বতী' কবিতাটিতে—

একদা এমনই বাদল শেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।

এই চিরন্তন প্রেমের সুর পাঠকেরও হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়।

কবি ও পাঠক কিন্তু সব সময়েই এত সহজে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন না। যোগস্থাপনের পথে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়, এবং সেজন্য দায়ী কবি এবং পাঠক দুজনেই। পাঠকের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ব্যক্তিগত রুচি। 'রুচি' কথাটি সাধারণত দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়—ভালোলাগা মন্দলাগা এবং বিচারশক্তি। ভালোলাগা কতকটা সহজাত প্রবৃত্তির মতো, এর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি থাকে না। কিন্তু কেন ভালো লাগে বা লাগে না, পাঠকের মনে যখন এই রকম প্রশ্নের উদয় হয়, তখন বুঝতে হবে তাঁর স্বাভাবিক কাব্যানুরাগ নিয়ে তিনি ঠিক সন্তুষ্ট নন, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তাঁর রুচিকে তিনি যাচাই করে দেখতে চান। এইভাবে রুচি ক্রমশ মার্জিত হয়ে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে পরিণত হয়। বাল্যকালে আমাদের যা ভালো লাগে পরিণত বয়সে আমরা যে তার প্রতি আকৃষ্ট হই না তার একটা কারণ এই রুচির বহুল পরিবর্তন। শিক্ষা, যুগবিশেষের চিন্তাধারা, প্রচলিত সমালোচনা-সাহিত্য এবং মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাঠকের রুচির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যুগধর্মের প্রভাব কিন্তু সব সময়ে কল্যাণদায়ক হয় না, অবস্থাবিশেষে তাঁকে বিপথেও চালিত করে। সাহিত্যের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। আঠারো শতকে শেক্সপিয়রের মর্মভেদী ট্র্যাজেডি 'কিং লিয়র' কমেডিতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তা শ্রোতৃবর্গের প্রশংসাও অর্জন করেছিল! সমষ্টিগত রুচি যেখানে এত বিকৃত সেখানে সাধারণ পাঠক খুব সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সাধারণ অবস্থাতেও তিনি ভুল করেন। তাঁর প্রধান কর্তব্য যতটা

সম্ভব নিরপেক্ষভাবে এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে লেখকের মূল বক্তব্যটি প্রণিধান করা। মনে রাখা দরকার প্রত্যেক কবি একটা স্বতন্ত্র কাব্যজগতের সৃষ্টি করেন। সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করতে গেলে সেই কবির প্রতি পাঠককে সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। আর যদি তিনি ব্যক্তিগত সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়ে তাঁর ভাব ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃক্‌পাত না করেন তাহলে রসগ্রহণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। কেউ যদি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রীতি বিহারীলালের কাব্যে খোঁজেন কিংবা কালিদাস রায়ের কাব্যশৈলীকে মাপকাঠি করে অতি-আধুনিক কাব্যের বিচার করেন তাহলে বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। কাব্যের ঐতিহ্য এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় থাকা আবশ্যক। অন্যথা কবিতার ভাষানুষঙ্গ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' ও 'বর্ষামঙ্গল' সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটি না জানা থাকলে কবিতা দুটিতে যে আবহমণ্ডল রচিত হয়েছে তা অননুভূতই থেকে যাবে।

লেখকের সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে তাঁর অত্যধিক আত্ম-কেন্দ্রিকতা। বিশ্বজনীন ভাব উপেক্ষা করে তিনি যদি সর্বক্ষণ নিজের ভাবেই বিহ্বল হয়ে থাকেন তা হলে তিনি পাঠকের মনের উপর কোনো রেখাপাত করতে পারবেন না। কাব্যের বিশ্বজনীনতা আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সুতরাং সে প্রসঙ্গের পুনরবতারণা না করে ওরই সঙ্গে সম্পৃক্ত আর একটি বিষয়—অর্থাৎ সমাজ-চেতনা—এখানে উত্থাপিত করতে চাই। কবির ব্যক্তিচেতনা যতই প্রবল হোক, সামাজিক হিসাবে সমাজচেতনার প্রতি তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। ঔদাসীন্য মানে পলায়নী বৃত্তি এবং এটি সুস্থমনের পরিচায়ক নয়। একাধিক ইংরেজ রোমান্টিক কবি ও ফরাসী প্রতীকবাদী কবি এই বৃত্তি অবলম্বন করে স্থানে স্থানে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন।[৩১] আইরিশ কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েটসও

৩১। রোমান্টিক কাব্যের উপর অবশ্য ফরাসী বিপ্লব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গজদন্তনির্মিত মিনারে বসে এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছিলেন বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু শেষ বয়সে নির্ভীক চিত্তে যখন তিনি এই বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর কবিতা—যথা 'টাওআর', 'বাইজ্যানটিয়ম'—আরো বলিষ্ঠ ও অধিকতর অর্থসমন্বিত হল। রবীন্দ্রনাথও 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো' বাঁশি না বাজিয়ে 'সংসারের তীরে' ফিরে এসে 'মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত' শুনিয়েছিলেন। বস্তুত কবিকে বলা যায় সমাজের প্রতিভূ,[৩২] সমাজের হৃৎস্পন্দন তাঁর রচনায় সমধিক স্পষ্ট অনুভূত হয়। তিনি সমাজের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন আবার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারও করেন। সর্বসাধারণের বিশৃঙ্খল ভাবগুলি তাঁর কাব্যে সুসম্বদ্ধ হয় এবং তখন লোকে যেন নিজেদেরই ঠিকমত চিনতে পারে। প্রতিভাসম্পন্ন কবি অবশ্য শুধু সমাজের মুখপাত্র নন। সমাজমনের ভাবগুলি ব্যক্ত করলেই[৩৩] তাঁর কর্তব্য সমাধা হয় না। কারণ সমসাময়িক পাঠক-সম্প্রদায়ের চিত্তজয়ই কাব্যের স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কবিকে সময়েরও 'হৃদয় হরণ করতে হয়' এবং সে উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে তাঁকে স্বধর্মনিষ্ঠ হতে হবে অর্থাৎ অনায়াসলভ্য খ্যাতির মোহ ত্যাগ করে কাব্যসত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। মোট কথা, ব্যক্তিচেতনা অথবা সমাজচেতনা কোনোটিকেই বেশী প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সমাজের সঙ্গে পরিপূর্ণ অসহযোগ এবং সহযোগ—দুইয়েরই ফল মূলত অভিন্ন। প্রথমটি ভাবসঞ্চারণের সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং দ্বিতীয়টি যে ভাব সঞ্চারিত করে তার সঙ্গে রসের কোনো সম্পর্ক নেই।

লেখকের আর একটি ত্রুটি রচনারীতির দুর্বোধ্যতা। আধুনিক কাব্যে এই ত্রুটি অধিক মাত্রায় বিদ্যমান।[৩৪] সমাজ ও ব্যক্তিমানস

৩২। দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৩। তুলনীয়: 'What oft was thought but ne'er so well expressed' (Pope)

৩৪। সব যুগের কাব্যই অবশ্য অল্পবিস্তর দুরূহ। কিন্তু আধুনিক কাব্যের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতা অভিযোগ আনা হয় এর উদ্ধৃতি বাহুল্য, ভাবসমূহের পারম্পর্যহীনতা প্রভৃতির জন্য।

যখন উদ্‌ভ্রান্ত তখন সুললিত রাগিণীর ঝংকার শ্রুতিকটু মনে হতে পারে এবং বর্তমান জীবনের জটিলতা প্রস্ফুট করার জন্য গতানুগতিক কাব্যশৈলী গ্রহণীয় নয়, এ কথাও সত্য, তবুও যা জটিল তাকে আরো জটিল করার কোনো অর্থ হয় না। এতে পাঠকের চমক লাগে কিন্তু মন ভরে না। গুহাহিত অর্থ অধ্যাত্মদর্শনের মর্যাদাবৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু কাব্যের মূল্যহ্রাস করে।

কবিতার লক্ষ্য কি?

কবিতায় আনন্দোপলব্ধি

কবিতা কি এবং কবিতার লক্ষ্য কি—এ দুটি প্রশ্নই অত্যন্ত সনাতন, এবং প্রথমটির মতো দ্বিতীয়টিকেও কেন্দ্র করে এত বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে যে এখানেও দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বধর্মনিষ্ঠ কবি কোনো পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাব্য রচনা করেন—এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তা কাব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। তাঁর সৃজনক্রিয়ার আদিকারণ—আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা, অর্থাৎ অনেকটা নিজের গরজেই তিনি কবিকর্মে ব্রতী হন এবং কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না। সুতরাং তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে কাব্যপ্রয়াসকে সার্থক করে তোলা।

তবুও অন্যবিধ উদ্দেশ্যের প্রশ্ন ওঠে। এবং সাধারণত আমরা দেখতে পাই, আনন্দ, সৌন্দর্য ও নীতি—এই তিনটি দিক থেকে কবিতার উদ্দেশ্য বিচার করা হয়। আনন্দদানকে যাঁরা কাব্যের উদ্দেশ্য মনে করেন তাঁদের আদিগুরু—অন্তত ইউরোপে—সম্ভবত অ্যারিস্টট্‌ল্, যদিও বিষয়টির বিশদ বর্ণনা তাঁর কোনো রচনাতে পাওয়া যায় না। শ্রেণীভেদে কবিতা একটা বিশেষ আনন্দের সঞ্চার করে—'পোএটিক্‌স্'এ শুধু এইটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। পরে অনেকেই এই প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অবিমিশ্র আনন্দের পরিবর্তে নৈতিক প্রশ্নকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আনন্দের সঞ্চার একটা উপায় মাত্র, কবির আসল লক্ষ্য শিক্ষাদান।[১] আনন্দতত্ত্ব প্রথমে স্বপ্রতিষ্ঠ হয় ওআর্ডসওআর্থ, কোলরিজ ও শেলির কাব্যালোচনায়। মানবহৃদয় ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে নিবিড় ঐক্য রয়েছে, ওআর্ডসওআর্থের কাছে

১। ড্রাইডেনের 'এসে অন ড্রামাটিক পোএসি' দ্রষ্টব্য।

সেই ঐক্যই জীবনের পরম সত্য। এই সত্যের উজ্জ্বল রশ্মি যখন আবেগের মধ্য দিয়ে কবির হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত হয় তখনই তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দবোধ তাঁর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং এর দ্বারা পাঠককে উদ্দীপিত করাই তাঁর প্রধান বৃত্তি। বৈজ্ঞানিক সত্যও আমাদের আনন্দ দান' করে। কিন্তু এ আনন্দ জ্ঞানলব্ধ, এবং সেইজন্য স্বল্পক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানার্জনের মুহূর্তটি খুবই চাঞ্চল্যকর, কিন্তু পরে আর ঐ বিষয়ে কোনো কৌতূহল থাকে না। অপরপক্ষে, কাব্যপাঠজনিত আনন্দের ক্ষয় নেই। এর কারণ কাব্যগত ঐক্য—যার উপর কবির প্রকাশকার্যের সাফল্য নির্ভর করে। কবিতার সমগ্র সত্তা এবং এর অংশবিশেষ আমাদের হৃদয়ে একই প্রকার আনন্দ উদ্রিক্ত করে,[২] অর্থাৎ কাব্যপাঠে আমরা লাভ করি সংগতি-বোধের আনন্দ, যা ব্যবহারিক জগতে অতিশয় দুর্লভ। বাস্তব জীবনের অসংগতিতেই আমরা অভ্যস্ত, এবং সেইজন্য যখনই আমরা কাব্যেব ঐ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য অনুভব করি, তখনই আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে।

এই আনন্দেব একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে এর সঙ্গে প্রয়োজন-বোধের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা যখন কোনো ঈপ্সিত বস্তু অর্জন করি অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে যখন আমাদের কোনো বাসনা চরিতার্থ হয় তখনও আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু সে আনন্দ স্বার্থসিদ্ধির ফল। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনন্দ অপেক্ষাকৃত স্বার্থমুক্ত হতে পারে—যেমন পড়াশোনা অথবা খেলাধুলার ব্যাপার—তবুও আমরা জ্ঞানান্বেষী, ক্রীড়ামোদী এবং কাব্যরসিককে সমশ্রেণীভুক্ত করতে পারি না। জ্ঞানলব্ধ আনন্দের কথা আমরা আগেই বলেছি। আর ক্রীড়ানুরাগ সম্পর্কে আমরা অন্তত এইটুকু বলতে পারি যে এর মধ্যে আর যাই থাক কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতির স্ফুরণ নেই। একই ব্যক্তি অবশ্য ক্রীড়া-এবং-কাব্যাসক্ত হতে পারেন, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে তিনি দুরকম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শিল্পসঞ্জাত আবেগ একটা

২। কোলরিজের 'বায়োগ্র্যাফিয়া লিটারারিয়া' দ্রষ্টব্য।

স্বতন্ত্র আবেগ জাগিয়ে দেয়—যার নাম দেওয়া যায় নান্দনিক (aesthetic) দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমাদের নিঃস্বার্থ আনন্দের উৎপত্তি হয় এবং এরই প্রভাবে আমরা কবির দানকে চরম মূল্য দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না।

কবিতায় সৌন্দর্যোপলব্ধি

কবিতার উদ্দেশ্যবিচারে আনন্দতত্ত্ব এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব—দুইই তুল্যমূল্য। কবিকর্মের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেই আমরা আনন্দ পাই, সুতরাং আনন্দদান অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি যাকেই আমরা কবিতার উদ্দেশ্য বলি না কেন, তাতে অর্থগত কোনো বিশেষ তারতম্য সূচিত হয় না। আনন্দ ও সৌন্দর্যের এই সন্নিকর্ষ সত্ত্বেও কাব্যসৌন্দর্যের পৃথক আলোচনা নিশ্চয়ই নিরর্থক নয়।

কবিতার বিষয়বস্তু এবং রূপকলার মিলিত সত্তা যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমরা কবিতাটিকে বলি রসোত্তীর্ণ এবং লাবণ্যময়। অনেকে কিন্তু ভুল করে শুধু বিষয়বস্তু কিংবা শুধু রূপকলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। বিষয়বস্তুকে যখন মুখ্য করে তোলা হয় তখন কাব্যবহির্ভূত অন্য প্রসঙ্গ— যথা নীতি বা দর্শনতত্ত্ব[৩] এসে পড়ে। আর রূপকলাকে প্রাধান্য দিলে কবিতা হয়ে দাঁড়ায় বস্তুনিরপেক্ষ। কিন্তু সর্বপ্রকার শিল্পকর্মে ভাব ও রূপের সম্পর্ক অনেকটা প্রাণ ও দেহের সম্পর্কের মতো। একটিকে বাদ দিলে অপরটির কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ভাব থেকেই রূপের জন্ম, এবং আমরা বাইরে থেকে যা দেখি সেটি ঐ ভাবেরই দেহ, স্বাশ্রয়ী কোনো ছন্দ বা শব্দবিন্যাস নয়। ভাব যখন বদলায় তখন ভাষা, ছন্দ এবং স্তবকগঠনও সেই সঙ্গে বদলে যায়। এর একটি চমৎকার উদাহরণ মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। এর ভাবগাম্ভীর্যই বাঙলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। এই নূতন ছন্দ বিষয়ালম্বী, না হলে এর সত্যকার কোনো মূল্য থাকত না।

৩। পরবর্তী বিভাগ দ্রষ্টব্য।

সাম্প্রতিক কালে শিল্পরূপের স্তাবকরূপে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে ক্লাইভ বেল ও রোজার ফ্রাইএর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বেল রূপকলাকে বলেছেন 'সিগনিফিক্যান্ট', অর্থব্যঞ্জক। কিন্তু যে অর্থ ব্যঞ্জিত হয় তা ঐ রূপের মধ্যেই বিদ্যমান, অর্থাৎ রূপ যেন নিজেরই ব্যঞ্জনা। শিল্পগত ঐক্য বেল অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তিনি এর বিচার করেছেন কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। বিষয়বস্তু বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তাকে আমাদের কলুষিত জীবনের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে এই রূপেরই পক্ষপুটতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। ফ্রাইএর মতেও সৌন্দর্য আমাদের অন্তরে যে নান্দনিক আবেগ জাগ্রত করে রূপকলাই তার একমাত্র আলম্বন।

চিত্রকলার ক্ষেত্রে এটা হয়তো অসম্ভব নয়, তবে সাধারণ হিসাবে বলা যায় সৌন্দর্যবোধের মধ্যে যদি কোনো গভীরতর জীবনসত্যের সংকেত না থাকে তা হলে তাতে আমাদের মনের ঠিক ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। বেলও পরম সত্তার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে আমবা এর আভাস পাই শুধু বর্ণ ও রেখার একটা বিশেষ সংযোজনা দেখে। মন্তব্যটি স্পষ্টত বিতর্কমূলক, এবং শিল্পালোচনায় একে যে মূল্যই দেওয়া হোক, কাব্যবিচারপ্রসঙ্গে এর উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে পারি না। মহৎ কাব্য কল্পনামণ্ডিত জীবন-সত্যকেই প্রকাশ করে। এই সত্যই সৌন্দর্য। একে আমরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করি। যা আমরা বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করি সেটি জ্ঞানের বস্তু, আর উপলব্ধ সত্য অর্থাৎ সৌন্দর্যকে আমরা স্বীকৃতি দান করি,[৪] আবার "যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেই-খানেই আমরা আনন্দকে দেখতে পাই।...উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি', যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি

৪। 'কিন্তু সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি—জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে': রবীন্দ্রনাথ: 'সাহিত্যের স্বরূপ'।

হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty,[৫] সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।"[৬]

জীবনে যা কুৎসিত কাব্যে তাও সুন্দর মনে হয়। এর একটা কারণ কবিতার সমগ্রতা বা ঐক্য। কুৎসিত বস্তু বা ব্যক্তি ঐ সমগ্র সত্তার একটা বিশেষ অংশ, এবং কবিতার অন্যবিধ উপাদানের সঙ্গে এই কদর্য উপাদান এমনভাবে মিলে গেছে যে ঐ পরিবেশে একে আর বিসদৃশ ঠেকে না। কখনও কখনও আবার বৈসাদৃশ্যকেই প্রকট করে তোলা হয়, সেক্ষেত্রে কবির উদ্দেশ্য মূলভাবের অর্থঘনত্ব আরও বৃদ্ধি করা। এলিয়টের অনেক রচনাতে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। বিগত বৈভবের চিত্র এবং অসংখ্য কুশ্রী রূপকল্প তিনি একত্র সন্নিবিষ্ট করে সমসাময়িক সভ্যতার রিক্ততা ফুটিয়ে তুলেছেন 'ওএস্টল্যাণ্ড', 'সুইনি ইরেক্ট' প্রভৃতি কবিতাতে। তা ছাড়া জীবনের কুশ্রীতা যখন কাব্যে প্রতিবিম্বিত হয় তখন আমরা তাকে নূতন ক'রে চিনতে পারি এবং এই চেনার আনন্দই সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে দেয়।[৭] অবশ্য এই প্রতিবিম্ব দেখেই আমরা আনন্দ পাই না, জীবনের গভীরতা ও বৈচিত্র্য দর্শনেই আমাদের ভাবান্তর হয়। এমন কি ভয়াবহ কদর্যতা দেখেও আমরা অবিচলিত থাকি এবং এটা কি করে সম্ভব হতে পারে তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্দেশকল্পে 'মানস দূরত্ববোধ' (psychic distance) কথাটি প্রয়োগ করা হয়। এর অর্থ এই যে কাব্য বস্তুনিরপেক্ষ না হলেও নগ্ন, বাস্তব সত্যের অবিকল প্রতিমূর্তি নয় এবং সেইজন্য কাব্যলোকে যখন আমরা এডমাণ্ড (শেক্সপিয়রের 'কিং লিয়র') অথবা ইয়াগোর ('ওথেলো') মতো দুর্বৃত্তদের সঙ্গে পরিচিত হই তখন তাদের জগৎ এবং আমাদের

৫। 'Beauty is truth, truth beauty'—কিটস্ : 'ওড অন এ গ্রিসিয়ান আর্ন্'।

৬। রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য : সৌন্দর্যবোধ'।

৭। অ্যারিস্টটল্ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

জগতের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকে, এই ব্যবধানই আমাদের সৌন্দর্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

কবিতায় নৈতিকতা

নীতিশিক্ষাদান সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি না—এই প্রশ্ন নিয়েই সব চেয়ে বেশী বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্য যে নীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত—প্রাচীনকালে এই বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং এখনো অন্য আকারে বলবৎ আছে বললে সত্যের অপলাপ হবে না। আমাদের দেশে কাব্যপাঠকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ মনে করা হত, এবং কবিরা যে নিজেই এ মতের পোষক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'। 'রামায়ণে'র উত্তরকাণ্ডে সমাজনীতির প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এবং 'মহাভারতে' রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির বিশ্লেষণ তো আছেই, উপরন্তু উচ্চ ধর্মতত্ত্বেরও বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া হয়েছে ভীষ্মপর্ব[৮] ও শান্তিপর্বে। সংস্কৃত ক্লাসিক যুগের কাব্যেও, যথা অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দে' এবং কালিদাসের 'রঘুবংশে' যথাক্রমে অধ্যাত্মবাদ ও রাজধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রীক কাব্যকে অনুরূপ মর্যাদা দেওয়া হত। লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আদর্শ চরিত্র অঙ্কন ও দেবদেবীর প্রশস্তিগানের দ্বারা কবিসম্প্রদায় শিক্ষার্থীদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করবে। এ বিশ্বাস যে অভ্রান্ত নয় প্লেটোই সর্বপ্রথম তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে দুটি কারণে কাব্যের প্রভাব মঙ্গলজনক হতে পারে না; প্রথম, এতে সত্যের বিকৃতি ঘটে,[৯] এবং দ্বিতীয়, আবেগকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি হোমারঅঙ্কিত দেবতাদের দুর্নীতিপরায়ণতা এবং অ্যাকিলিসের আবেগজনিত চিত্তদৌর্বল্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অ্যারিস্টটল

৮। 'ভগবদ্গীতা' এরই অন্তর্গত।

৯। প্রথম অধ্যায়' বিভাগ ৭ দ্রষ্টব্য।

প্লেটোর মতো নীতিবাগীশ ছিলেন না, কিন্তু তিনিও তৎকালীন নীতিপ্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। আবেগময়তার কুফল সম্পর্কে প্লেটো যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তিনি সেটি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'Tragedy through pity and fear effects a purgation of such emotions' ('পোএটিক্‌স্‌'), কিন্তু 'ক্যাথারসিস' বা 'পরিশোধন' যে একটা নৈতিক ক্রিয়া, পরোক্ষে তিনি এইরকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্লেটো-অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বহু সমালোচক ও কবি সাহিত্যের সঙ্গে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত করেছেন। কেউ কেউ অবশ্য—যেমন ড্রাইডেন ও ডক্টর জনসন—অবিমিশ্র নৈতিকতা পরিহার করে এর উপর একটা আনন্দের প্রলেপ দিয়েছেন। জন রাসকিন এ দিক দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং জাগতিক উন্নতিবিধানকে তিনি শিল্পের উদ্দেশ্য বলে প্রচার করতে লেশমাত্র সংকোচ বোধ করেন নি। টলস্টয়ও ললিতকলাকে অধ্যাত্মশাস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করেন। এবং তাঁর নিজস্ব বিধান অনুসারে 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস', 'রেসারেকশন' প্রভৃতি অতুলনীয় উপন্যাসকে আমরা সাহিত্যজগৎ থেকে বহিষ্কৃত করতে পারি।

উল্লিখিত লেখকবর্গেব মধ্যে অনেকেই ঠিক স্থূল অর্থে হয়তো 'নীতি' শব্দটি ব্যবহার করেন নি, তবুও কবিতা থেকে আমরা নীতিশিক্ষা লাভ করি—এ কথার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে কবিতাটিতে কোনো নৈতিক সত্য স্বমহিমায় বিরাজ করছে, এবং সেটি যদি রচনা থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়—শিক্ষালাভ বলতে একরকম তা-ই বোঝায়—তা হলেও কবিতাটির কোনো অঙ্গহানি হবে না। অর্থাৎ কবিতার যা প্রধান লক্ষণ অর্থাৎ অখণ্ডতা তারই এখানে একান্ত অভাব। সুতরাং রচনাটির যথার্থ অভিধা হওয়া উচিত ছন্দোবদ্ধ নীতিবচন, কবিতা নয়। কবিতা অবশ্য নৈতিক সত্যেরও আধার হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আধার ও আধেয়ের মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। নৈতিক সত্যের এখানে কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, কবিতাটি

আমাদের সমগ্রভাবে প্রভাবিত করে। দুটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা 'নীতি-কবিতা' ও 'কবিতা'র পার্থক্যনির্ণয়ের চেষ্টা করব।

যূথী বলে, 'কিন্তু ভাই, রূপ কিছু নয়,
গুণের আদর দেখ চিরস্থায়ী হয়।
চিরদিন দিয়ে থাকি মধুর সৌরভ,
বংশক্রমে আছে মোর গুণের গৌরব'।

(রজনীকান্ত সেন : 'রূপ ও গুণ।')

এই স্তবকটির মূল ভাব গুণের চিরস্থায়িত্ব, এবং এইটিকেই ছন্দোরূপ দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের :

দিনান্তের মুখ চুম্বি' রাত্রি ধীরে কয়,—
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়,
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে ক'রে দিই প্রত্যহ নবীন।

('কণিকা' : 'চিরনবীনতা'।)

রবীন্দ্রকাব্যজগতে কবিতাটির স্থান তেমন উঁচুতে নয়, তবুও এতে ভাবের কিছুটা ব্যঞ্জনা রয়েছে, এবং প্রথম চরণের রূপকল্পও লক্ষণীয়।

কোনো নৈতিক সত্য যখন কবির হৃদয়াবেগে পরিণত হয় তখনই তা কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হতে পারে। হৃদয়াবেগ কি পরিণতি লাভ করে তা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পর্যালোচনা করেছি, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি সংগত হবে না। নাট্যকাব্যে নীতি-বাক্য কি ভাবে প্রযুক্ত হয় বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তারই একটু আভাস দেব। নাটকে আমরা প্রায়ই দেখি নীতিবাক্যের আভিধানিক অর্থ অত্যন্ত গৌণ। এর আসল অর্থ নিরূপিত হয় বক্তার মনোভাব ও নাটকীয় পরিস্থিতির দ্বারা।

We are such stuff as dreams are made on (শেক্সপিয়র : 'দে টেম্পেস্ট')।

এর অর্থ এমনিতেই খুব গভীর, কিন্তু প্রস্‌পেরো যে বিশেষ অবস্থায় এটি উচ্চারণ করেছে সেটি জানা থাকলে কি অর্থ অধিকতর গভীর হয় না ?

আবার ইয়াগোর মতো দুর্বৃত্ত যখন তত্ত্বকথা আওড়ায় তখন বুঝতে হবে এটা শুধুই বাগাড়ম্বর, এর পিছনে আছে কোনো জঘন্য শয়তানি। ইয়াগো ওথেলোকে বলছে, মানুষ সুনাম হারালে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কথাটার তাত্ত্বিক মূল্য অবজ্ঞেয় নয়। কিন্তু এখানে বক্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ওথেলোর মনে ঈর্ষা জাগানো। কেউ যদি বলে শেক্সপিয়র একটা শয়তানকে তাঁর মুখপাত্র করে আমাদের নীতিকথা শোনাচ্ছেন তা হলে সেটা হবে হাস্যকর প্রলাপোক্তি।

নাটক অথবা কাব্য, কোনোটিতেই নীতি শুধু নীতি হিসাবেই গৃহীত হতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে নীতিতত্ত্বের কোনো সর্বজনীন আবেদন নেই। এক দেশের যা নৈতিক আদর্শ অন্য দেশে তা মূল্যহীন, আবার যুগের পরিবর্তনে একই দেশের আদর্শ অনেক সময়ে বদলে যায়। সুতরাং এই আদর্শ যখন কবিতার বিষয়বস্তু হয় তখন যদি তার শিল্পসম্মত রূপান্তর না ঘটে তা হলে কবিতাটির অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দেশাত্মবোধের প্রেরণায় বাঙলাদেশে অনেক কবিতা রচিত হয়েছিল, এবং এক সময়ে তারা অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এখন ঐজাতীয় অধিকাংশ রচনা বিস্মৃতপ্রায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ সেন ও নজরুল ইসলামের কয়েকটি কবিতা ছাড়া বাকী সব বাঙালী জাতীয় অভ্যুদয়ের বিস্তারিত ইতিহাসে স্থান পেতে পারে—কাব্য-ইতিহাসে নয়।

মার্কসবাদী সমালোচকেরা সাহিত্য বা কাব্যের সামাজিক প্রভাবের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে সাহিত্য শুধু যে যুগধর্মের অভিব্যক্তি তাই নয়, এতে শ্রেণীসংগ্রামেরও প্রভাব আছে, যদিও সে প্রভাব সব সময়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিফলিত হয় সমাজমানসে এবং এই মানসদ্বন্দ্ব সাহিত্য সৃষ্টির আদিম প্রেরণা।[১০] শিল্পকর্মে সমাজচেতনা বা যুগধর্মের

১০। সাহিত্যের উৎপত্তি নির্ণয়কল্পে মার্কসবাদীরা প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন। ক্রিস্টফার কডওএলের 'ইলিউসন ও রিয়্যালিটি' দ্রষ্টব্য।

(zeitzeist) প্রভাব আগেও লক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এইটিই সৃজনক্রিয়ার একমাত্র নিয়ামক কি না সে বিষয়ে বিতর্কের উদ্ভব হতে পারে। সামাজিক হিসাবে কবি সমাজের দাবি অস্বীকার করতে পারে না, এ সত্য অবিসংবাদিত হলেও[১১] যে রীতি অনুসারে তিনি সে দাবি পূর্ণ করেন সেটা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর স্বকীয়তার দ্বারা। মার্কসবাদীরা অবশ্য লেখকের ব্যক্তিত্ব কিংবা সৃজনপ্রতিভা সম্পর্কে অচেতন নন, কিন্তু তবুও সন্দেহ হয় এর মূল্যবত্তা তাঁরা যেন ঠিক তলিয়ে দেখেন নি। তাঁরা লেখকের সমাজ-চেতনার গভীরতা বা অগভীরতাকে তাঁর রচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণ বলে মনে করেছেন, এবং এ ধারণা যদি সত্য হয় তা হলে আমরা বেন জনসনকে স্বচ্ছন্দে শেক্সপিয়রের উপরে স্থান দিতে পারি। কারণ বেন জনসনের বাস্তববোধ ও সমাজচেতনা শেক্সপিয়রের চেয়ে নিঃসন্দেহে গভীরতর ছিল, এবং এটি তাঁর কমেডিতে নয়, ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিতেও প্রকট। শেক্সপিয়রও রেনেসাঁস ভাবধারার বাহক ছিলেন, এবং এলিজাবেথীয় যুগের নবজাগ্রত চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তবুও ঠিক সমাজচেতনা বলতে যা বোঝায় সে দিক দিয়ে দেখলে বেন জনসনের নাটককে অধিকতর সাহিত্যিক মর্যাদা দিতে হয়। অথচ শেক্সপিয়র আজ দেশে—এমন কি সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রেও—পূজ্য আর বেন জনসনের সঙ্গে পরিচিত শুধু ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রেরা। এর কারণ খুব সহজেই অনুমেয়। শেক্সপিয়র তাঁর লোকোত্তর প্রতিভাবলে সমাজসত্যকে জাগতিক সত্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাটকে এলিজাবেথীয় সমাজ-মানস বিশ্বমানসে রূপান্তরিত হয়েছিল, তাই তাঁর আবেদন সার্বভৌম।

শুধু সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের মূল্য বিচার করলে তার বিশ্বজনীন রূপটি দৃষ্টিগোচর হবে না। 'মেঘদূতে'র মার্কসীয় বিচার কি রকম হতে পারে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নীরেন্দ্রনাথ

১১। প্রথম অধ্যায় বিভাগ ৯ দ্রষ্টব্য।

রায়ের 'সাহিত্য-দীক্ষা'য় : "গজদন্ত মিনারে বাস করিয়া শ্রেষ্ঠ কবির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায় না—সাহিত্যের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য। মেঘদূতের কবিও রাজসভার নিত্য-সহচর ছিলেন, আর বিরহী যক্ষের বিরহও স্বেচ্ছাবৃত নিঃসঙ্গতা নহে। আমরা বড় সহজে ভুলিয়া যাই যে তাহার সুদীর্ঘ বিলাপ প্রিয়বিচ্ছেদের প্রকাশ ততটা নয় যতটা স্বাধিকারপ্রমত্ত সামান্য অনবধানের ত্রুটিতে সুখের স্বর্গ অলকা হইতে নির্বাসনের জন্য প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ। প্রভুশক্তিকে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা তখন দেখা দেয় নাই, প্রতিবাদ করার সামর্থ্যও তখন জাগে নাই, তাই পরোক্ষ অভিযোগ করিয়াই যক্ষকে ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবুও যে মেঘদূত আজও আমাদের মনকে নাড়া দেয় তাহার কারণ প্রবাসী যক্ষের মতো আমরাও আমাদের কামনার স্বর্গ হইতে বঞ্চিত নিজেদের ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতিতেও ততটা নয় যতটা বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক প্রভুশক্তির প্রবল প্রতাপে। অতীতের ব্যর্থতার সুর বর্তমানের ব্যর্থতার তন্ত্রীতে অনুরণন জাগাইয়া তোলে। রাজসভার আড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়াও জনগণের ব্যর্থতাকে বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই কালিদাস মহাকবি'।[১২]

১২। এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : কত নববর্ষার মেঘ, বলাকার শ্রেণী, তপ্ত ধরণীর 'পরে বারিসেচনের সুগন্ধ। কত পর্বত-অরণ্য নদী-নির্ঝর নগর-গ্রামের উপর দিয়া ঘনপুঞ্জ গম্ভীর আষাঢ়ের স্নিগ্ধ সঞ্চার। কবির মনে কতদিন ধরিয়া কত ভাবের ছায়া সৌন্দর্যের পুলক বেদনার আভাস রাখিয়া গেছে। কাহার মনেই বা না রাখে। জগৎ তো দিনরাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে, এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু-না-কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই।

একদা কালিদাসের সেই তাঁহার বহুদিনের বহুতর ধ্বনিগুলি একটা সূত্র অবলম্বন করিবামাত্র একটার পর আর-একটা ভিড় করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কী সুন্দর দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। অনেক দিনের অনেক ভাবের ছবি কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির জন্য উমেদারি করিয়া বেড়াইতেছে। আজ তাহারা যক্ষের বিরহবার্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার স্তরে স্তরে মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে ঘনাইয়া উঠিল। আজ তাহারা একটির যোগে অক্ষুট এবং সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়া গেছে।

নীরেন্দ্রনাথ রায় এখানে বিশ্বজনীন ভাব অর্থাৎ বিরহের দিক থেকে 'মেঘদূতে'র বিচার করেন নি। তাঁর মতে 'বর্তমানের ব্যর্থতা'র জন্যে এই বিরহকাব্যের সুর আমাদের মর্ম স্পর্শ করে, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনো আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (যেখানে 'নৈর্ব্যক্তিক প্রভু-শক্তি'র অস্তিত্ব থাকবে না) এই ব্যর্থতার অবসান ঘটে তা হলে তখনও কি 'মেঘদূত' আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন জাগিয়ে তুলতে পারবে? এবং যদি না পারে তাহলে 'রাজসভার আড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়াও জনগণের ব্যর্থতাকে বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই' কি আমরা কালিদাসকে মহাকবি বলতে পারব? পারলেও সেটা হবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি, তার সঙ্গে রসোপলব্ধির কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

'সমাজচেতনা' কথাটিব অর্থ খুব ব্যাপক এবং সেইজন্য এত অস্পষ্ট। মহৎ কাব্যে যে কিভাবে এর ছায়া পড়ে তা মোটেই সহজ-নির্ণেয় নয়। কারণ ছায়া যখন কায়ায় পরিণত হয় তখন কায়া অর্থাৎ কাব্যরূপই আমাদের সমগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমাজচেতনার কথা আমরা একেবারেই ভুলে যাই। কিন্তু যেখানে ভোলা যায় না সেখানে কাব্যপ্রয়াসের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জাগে। এইজাতীয় রচনাতে দেখা যায় কোনো সামাজিক সমস্যানিরসনকল্পে লেখক তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু কোনো সমস্যাই সর্বকালীন নয়, এর সমাধান হলেই রচনাটির মূল্য হ্রাস পায় যদি না একে কেন্দ্র করে লেখক কোনো চিরন্তন হৃদয়াবেগের সঞ্চার করতে পারেন। সামাজিক প্রভাবকে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড করলে কিন্তু সমাজকেই গুরুত্ব দিতে হয় এবং 'আঙ্ক্‌ল্‌ টম্‌স্‌' ক্যাবিন'কে—যা দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদসাধনে সহায়ক হয়েছিল—যে কোনো উচ্চাঙ্গের কবিতা বা নাটকের চেয়ে বড় বলতে আমরা কুণ্ঠিত হব না।

প্রচারধর্মী সাহিত্য[১৩] সম্পর্কে একই মন্তব্য করা চলে। প্রত্যেক সাহিত্যিকই তাঁর জীবনবেদ প্রকাশ করেন, কিন্তু 'প্রকাশ' আর 'প্রচার'

১৩। এর একজন বড় অধিবক্তা জর্জ বার্নার্ড শ।

এক নয়। প্রকাশ আদ্যন্ত আবেগময়, সেইজন্য আমাদের সন্দেহ হয় না যে কবি কোনো তত্ত্ব প্রচার করছেন, কিন্তু যেখানে ব্যক্তিগত অথবা দলীয় মতবাদ প্রচারই লেখকের ঐকান্তিক উদ্দেশ্য সেখানে কাব্যের প্রকরণ থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় না। উপন্যাসে (যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বানিয়ান, ডিকেন্স প্রভৃতির রচনাতে) দেখা যায় যে রচয়িতার প্রচারপ্রবণতা সত্ত্বেও শিল্পগুণের হানি হয় না, কিন্তু কবিতা এতই দৃঢ়বদ্ধ যে প্রচারমূলক কোনো তথ্য শুধু তথ্য হিসাবে এখানে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে না।

নীতি তথা প্রচারধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যাঁরা কাব্যকে স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিপন্ন করতে চান তাঁদের বলা হয় কলাকৈবল্যবাদী ('আর্ট ফর আর্টস সেক' মতবাদের সমর্থক)। এঁদের ধারণা ললিতকলার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে সৌন্দর্যের এষণা। শিক্ষাদানের প্রবৃত্তি শিল্পের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী শিল্পক্ষেত্রে তা অবাঞ্ছনীয়। শিল্পীর স্বধর্ম হল বিষয়বস্তু এবং বাস্তব জগতের প্রতি চরম ঔদাসীন্য।[১৪] তাঁর কাছে একমাত্র সত্য তাঁর আবেগচঞ্চল মানসজীবন। যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন এবং প্রকাশ করেন তা অভিজ্ঞতা হিসেবেই মূল্যবান, ব্যবহারিক জীবনে তার কোনো প্রয়োজন নেই। ওআলটার পেটার বলছেন: '(শিল্পীর) লক্ষ্য অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার ফল নয়' ('স্টাডিজ ইন দে হিস্ট্রি অব দে রেনেসাঁস')।[১৫] এ. সি. ব্র্যাডলের 'অক্সফোর্ড লেকচারস অন পোএট্রি'তে এই মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলতে চান যে কবিতার মূল্য কবিতার মধ্যেই নিহিত। আমরা অন্য কোনো ফললাভ করতে পারি, কিন্তু কবিতার মূল্যায়নে ফলের কথা বিস্মৃত হওয়াই উচিত। এক কথায় কাব্যস্বরূপ 'একটি স্বতন্ত্র,

---

১৪। জে. এ এম. হুইসলারের 'টেন্-ও ক্লক লেকচার' এবং অসকার ওআইল্ডের 'ইনটেন্সন্স্: দে ডিকে অব্ লাইং' দ্রষ্টব্য।

১৫। পেটারের মত পরে আলোচিত হয়েছে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংশাসিত জগৎ', বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে এই কাব্যস্বরূপ কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পড়তে পারে।

কাব্যগত অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য এবং ঐশ্বর্য অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু তাই বলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে কাব্য এবং জীবনের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এবং আমরা যখন কাব্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করব তখন বহির্জগৎ আমাদের চোখের সামনে থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কাব্যসত্য যখন জীবনসত্যের রূপান্তর তখন জীবনই যে কাব্যের ভিত্তিস্বরূপ এই সহজ কথাটা আমরা কি করে ভুলে যাই? ইংলণ্ডে কলাকৈবল্য-বাদের উৎপত্তির কারণ খুব সম্ভব রাসকিন প্রমুখ লেখকদের উৎকট নীতিপ্রবণতা। তবে স্থূল নীতিবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নীতির গভীর ও ব্যাপক অর্থ এবং জীবন ও কাব্যের আত্মিক সংযোগ সম্পর্কে পরে অনেকটা সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। প্রসঙ্গত পেটারের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত হতে পারে: 'সু-শিল্প যদি মানুষের আনন্দবর্ধন, নির্যাতিতের মুক্তিসাধন অথবা আমাদের পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রসারণে সচেষ্ট হয়···তা হলে তাই হবে মহৎ শিল্প।' দৃষ্টান্তস্বরূপ পেটার দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত উৎকৃষ্ট শিল্প বা কাব্য সাধারণ অর্থে নীতিশিক্ষা না দিলেও আমাদের সংবিৎ গভীরভাবে আলোড়িত করে এবং তাতে যে আমাদের গতানুগতিক জীবনের আংশিক ঊর্ধ্বায়ন হয় সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি। শেলি বলতেন, 'নীতিকাব্যকে আমি ঘৃণা করি', কিন্তু তিনিও কাব্য ও নীতির সুগভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরই ভাষায়, নীতির মূল মন্ত্র হচ্ছে প্রেম এবং প্রেমানুভূতির অর্থ আত্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অপরের চিন্তায়, কার্যে ও চরিত্রে যে সৌন্দর্য আছে তার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। মনের এই বিপুল প্রসার সর্বতোভাবে কল্পনাসাপেক্ষ। কবিতা আমাদের

কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃত করে দেয় এবং তারই প্রত্যক্ষ ফল নৈতিক জাগৃতি।[১৬]

মহৎ কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফলে সত্যই আমাদের কল্পনানেত্র উন্মীলিত হয় এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ কালপ্রবাহ অতিক্রম করে ক্ষণকালের জন্য আমরা যেন অনন্তের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করি। ব্লেক বলেন, যে কল্পনাবৃত্তির অনুশীলন করে তার বাসভূমি 'অনন্তের উদয়াচল'। ওআর্ডসওআর্থ সিম্‌প্লন গিরিপথের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীকে মনে করেন

Characters of the great Apocalypse,
The types and symbols of Eternity,
Of first, and last, and midst, and without end.

রবীন্দ্রনাথও কল্পনা করেন সেই 'বিশ্বচিত্তলোকে'র

যেথা সুগভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।

১৬। জার্মান দর্শনবিৎ কাণ্টও বলেছেন, কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে কবিতা মনকে প্রসারিত করে।

বিষয়বস্তু, রূপকলা ও ভাষারীতি অনুসারে কবিতা তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, যথা নাট্যকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য। প্রত্যেকটি রূপ আবার বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় সমপর্যায়-ভুক্ত দুই প্রকার কবিতার মধ্যেও মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। সেইজন্য মনে হয় শ্রেণীবিভাগের উপর খুব বেশী জোর না দিয়ে বিভিন্ন কাব্যরূপের লক্ষণ-বিচারই অধিকতর যুক্তিসংগত। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই চেষ্টাই করব।

নাট্যকাব্যের আলোচনা এখানে অবান্তর না হলেও ঐ প্রসঙ্গ এখানে আমরা উত্থাপন করব না, কারণ কাব্য যখন নাটকের অঙ্গীভূত হয় তখন নাটকীয়তা বাদ দিয়ে কাব্যপ্রকৃতির বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয় না। যে বৈশিষ্ট্য নাট্যকাব্যকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে সেটি এর পরম নৈর্ব্যক্তিকতা। অন্য সর্বপ্রকার কবিতাতে লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের ছায়া পড়ে, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এরূপ ছায়াপাত বিপর্যয়সূচক। নাটকের সঙ্গে মহাকাব্যের নৈকট্য সবচেয়ে বেশী, তবুও নাট্যকার যতটা নির্লিপ্ত হতে পারেন মহাকবি ঠিক ততটা পারেন না, এবং মহাকাব্য রচনার পক্ষে ঐরকম চরম নির্লিপ্ততার প্রয়োজনও নেই।

মহাকাব্য (Epic)

মহাকাব্যের প্রাচীনত্ব সুবিদিত, এর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'epic' গ্রীক 'epos'এর রূপান্তর। 'Epos'এর আদিম অর্থ ছিল 'শব্দ'। পরে এর উপর বিভিন্ন অর্থ আরোপিত হয়, যথা বচন বা কাহিনী, গান, বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা অথবা কাব্য। পরিশেষে এপিকের অর্থ দাঁড়ায় কাহিনীমূলক, বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা। বাঙলা বা সংস্কৃতে 'মহাকাব্যে'র 'মহা' শব্দাংশের মধ্যেই এই বিশেষ কাব্যরূপের অভিধা সূচিত হয়েছে।

'পোএটিকস'-রচয়িতা অ্যারিস্টটল মহাকাব্য সমালোচনার প্রথম পথনির্দেশক। 'পোএটিকস'এর প্রধান বিচার্য বিষয় ট্র্যাজেডি, তবে প্রসঙ্গত তিনি মহাকাব্যেরও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার অনেকটা এই রকম: ট্র্যাজেডির মতো এপিকের আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এবং এর আদি-মধ্য-অন্ত-বিশিষ্ট সমগ্রতা প্রাণিবিশেষের জৈব অখণ্ডতার সহিত তুলনীয়। এই আখ্যানভাগ কখনও সরল (যেমন 'ইলিয়ড'এ), আবার কখনও জটিল (যেমন 'ওডিসি'তে)। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে অবশ্য ট্র্যাজেডি ও এপিকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মহাকাব্যের মূল আখ্যানের সঙ্গে নানা রকম উপাখ্যান সংযুক্ত হতে পারে; এবং যুগপৎ কয়েকটি ঘটনার সংস্থান এখানে নিন্দনীয় নয়। কিন্তু ট্র্যাজেডির সব কিছু সংঘটিত হয় মঞ্চের উপরে, এবং সেইজন্য একই সময়ে একাধিক ঘটনার সংস্থাপন সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ এপিকের চেয়ে ট্র্যাজেডি অনেক বেশী সুসংহত। ট্র্যাজেডি ও এপিকের আর একটি পার্থক্য হল ছন্দসম্পর্কিত। এপিকের ছন্দ হওয়া চাই ওজোগুণসম্পন্ন এবং হেক্সামিটারের (প্রত্যেক চরণে ছয়টি প্রস্বরিত ধ্বনি থাকে) উপযোগিতা এই দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী।

অ্যারিস্টটল এপিকের আরো দুটি বিশেষত্বের কথা বলেছেন—এর বস্তুনিষ্ঠতা এবং বিষয়বস্তুর অলৌকিকত্ব অথবা বিস্ময়াবহতা ও তার কাব্যসম্মত রূপায়ণ। দ্বিতীয় গুণটি অন্য প্রসঙ্গে আগেই আলোচিত হয়েছে, তবুও 'অবিশ্বাস্য সম্ভাব্যতার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য অসম্ভাব্যতা অধিকতর বাঞ্ছনীয়', অ্যারিস্টটলের এই সুচিন্তিত অভিমত বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুনিষ্ঠতার অর্থ কবির নির্লিপ্ততা, তাঁর বর্ণিত কাহিনীর অন্তরালে আত্মগোপন করা।

আমাদের আলংকারিক বিচার কতকটা বহিরঙ্গবিষয়ক। দণ্ডী বলছেন, মহাকাব্যের সর্গ নাতিদীর্ঘ, এবং প্রত্যেক সর্গের শেষে ছন্দের পরিবর্তন ঘটে। সূচনায় থাকে কোনো দেব বা দেবীর বন্দনা, আশীর্বচন ও বস্তুনির্দেশ। বিষয়বস্তু নেওয়া হয় কোনো পুরানো কাহিনী অথবা ঐতিহ্য থেকে, তবে ছোটোখাটো বিষয় কবির কল্পনা-

প্রসূত হতে পারে। প্রায় সব মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় নগর, সমুদ্র, পর্বত, ঋতু, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, উদ্যানক্রীড়া, জলকেলি, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন ইত্যাদি। বিশ্বনাথের মতে মহাকাব্য সর্গবন্ধ, এবং এর নায়ক কোনো দেবতা অথবা ধীরোদাত্তগুণান্বিত সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় অথবা উচ্চবংশোদ্ভূত বহু নৃপতি। মহাকাব্যের বৃত্ত বা কাহিনী ইতিহাস অথবা সজ্জনাশ্রয়ী, এবং কাহিনীবিন্যাসে নাটকস্থ সন্ধিগুলি বিদ্যমান। শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্তরস এর অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান রস, এবং অন্যান্য রস এই অঙ্গীরসের পরিপুষ্টি সাধন করে।

দণ্ডী বা বিশ্বনাথ কেউই মহাকাব্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। বৃত্ত, সন্ধি এবং সর্গের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কাহিনীগত ঐক্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। নায়ক সম্পর্কে বিশ্বনাথ যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাও ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। অশেষগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় স্বচ্ছন্দে নায়কের আসন গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এখানে দেবতাকে এনে হাজির করলে মহাকাব্যের অলৌকিকত্ব বাড়তে পারে, কিন্তু মানবীয় আবেদনের লাঘব হবে। রাম ও কৃষ্ণকে মানুষ মনে করলেই আমরা রামায়ণ-মহাভারতের মহত্ত্ব অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারব। মহাকাব্যের বহুনায়কত্ব আরো আপত্তিজনক, কারণ তাহলে কাহিনীগত ঐক্যের কোনো মূল্য থাকে না। কালিদাসের রঘুবংশ বহুনায়কত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, দিলীপ থেকে আরম্ভ করে কুশ পর্যন্ত রঘুবংশজাত প্রত্যেক রাজার জীবন ও বীরত্বকাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এবং যদিও ভাব ও রচনাশৈলীর উন্নত মান কোথাও অবনত হয় নি তবুও রঘুবংশকে মহাকাব্য না বলে একাধিক খণ্ডকাব্যের সমাহার বললে এর যথার্থ পরিচয় দেওয়া হবে।

উপাখ্যানবাহুল্য অবশ্য মহাকাব্যে অবিধেয় নয়। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'—এই প্রাচীন মহাকাব্যচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি অল্পবিস্তর ঘটনাভারাক্রান্ত। ঐক্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় 'ইলিয়ড' সর্বাধিক দৃঢ়পিনদ্ধ। এর মূল বিষয়বস্তু অ্যাকিলিসের ক্রোধ, এবং একেই কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা—যেগুলি

দশবর্ষব্যাপী ট্রয়যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে আবদ্ধ—আবর্তিত হচ্ছে। 'ওডিসি'তে স্থানকালের ব্যাপ্তি অনেক বেশী, এবং যে সব সমুদ্র-অভিযানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাদের যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ, তবে ইউলিসিস সব কাহিনীর নায়ক বলে একটা ভাবগত ঐক্যের আভাস পাওয়া যায়। 'রামায়ণে'ও মুখ্য ঘটনাগুলির সঙ্গে রাম ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। 'মহাভারতে'র ঘটনাবিন্যাসে কিন্তু যথেষ্ট শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। এমন অনেক উপাখ্যান (যেমন নল-দময়ন্তী ও সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনী) এখানে পরিবেশিত হয়েছে যাদের সঙ্গে মূল আখ্যানের কোন সংযোগ নেই। তদুপরি অধ্যাত্ম ও নীতিতত্ত্বকে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই তত্ত্বালোচনা স্থান পায় নি, স্থান জুড়েছে।

এই অসংগতি সত্ত্বেও 'মহাভারতে'র যে মহৎ গুণটি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে সেটি এর বিরাটত্ব। আখ্যানভাগের সারাংশটুকু, অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবের দ্বন্দ্ব, এমনিতে একটা বিরাট ব্যাপার নয়, কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই বিষয়বস্তুকে এমন অভাবনীয় বিস্তৃতি দান করেছেন যে একটা সমগ্র জাতির বর্ণাঢ্য মানসচিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। প্রসঙ্গত মনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ঐতিহ্যমূলক, এবং সে ঐতিহ্যের বিকৃতিসাধন নিন্দনীয় বলে পরিগণিত হয়। খুঁটিনাটি বিষয়ের অবশ্য অদলবদল ঘটতে পারে।[১] ঘটনা নির্বাচনে কবির স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস তিনি আক্রমণ করতে পারেন না।[২]

১। উপরে দণ্ডীর অভিমত দ্রষ্টব্য।

২। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মধুসূদন এই আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এর সপক্ষে যতই যুক্তি দেখানো যাক না কেন, দুটি ত্রুটি আমরা কোনোমতেই উপেক্ষা করতে পারি না। প্রথম, রাবণ-চরিত্রের স্ববিরোধিতা, দ্বিতীয়, মেঘনাদ ও লক্ষ্মণ চরিত্রের উৎকট বৈষম্য। রাবণ আত্মশক্তিতে আস্থাবান কিন্তু তাঁর ট্র্যাজিক পরিণামের জন্য দায়ী করেন শূর্পণখাকে। আর কাপুরুষ লক্ষ্মণকে মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে চিত্রিত করে মধুসূদন নায়কের মহত্ত্বকে খর্ব করেছেন।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। মহাকাব্যের আবির্ভাব যতই বিস্ময়কর হোক, এর পিছনে নিশ্চয় একটা প্রস্তুতিপর্ব ছিল। উর্বশীর মতো মহাকাব্য হঠাৎ একদিন 'আপনাতে আপনি বিকশি' প্রস্ফুটিত হল—এরূপ অনুমান কোনো দিক দিয়ে যুক্তিসিদ্ধ হবে না। প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য রচনার প্রাক্কালে বীরত্বব্যঞ্জক লোকগাথা, কিংবদন্তী ইত্যাদির প্রচলন ছিল, এবং এদেরই সুসমঞ্জস প্রকাশ 'রামায়ণ' অথবা 'ইলিয়ড'। মহাকবি যেন ঐসব বিক্ষিপ্ত কাহিনীকে একটি সূত্রে যোজনা করে 'দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করেন'। মহাকাব্যের মধ্যে যে সমগ্রতা দেখা যায় সেটি নিঃসন্দেহে ব্যক্তি-বিশেষেরই সৃষ্টি, কিন্তু স্রষ্টা এখানে সৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করেন। সেইজন্য 'মহাকবিরা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না' (রবীন্দ্রনাথ)।

মহাকাব্যের পটভূমি ও চরিত্রও আখ্যানভাগের মতো বিরাট ও অলৌকিক। সমস্ত গ্রীক জগৎ 'ইলিয়ড-ওডিসি'র এবং আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ 'রামায়ণ-মহাভারতে'র পটভূমিকা। কখনও কখনও আবার মর্ত্যের সীমা ছাড়িয়ে কবি স্বর্গ-নরক ও পাতালপুরীতে আরোহণ অথবা অবরোহণ করেন। মহাকাব্যের নায়ক এক বৃহত্তর সমাজের প্রতিভূস্থানীয়, এবং আমাদের তুলনায় তিনি এতই উচ্চস্তরের যে তাঁর সাধারণ কার্যকলাপও অপরূপ মহিমায় উজ্জ্বল। দোষগুণাশ্রিত হয়েও তিনি মহৎ আদর্শের প্রতিমূর্তি। তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত স্বকীয় মর্যাদা ও যুগোচিত ন্যায়ধর্মরক্ষা এবং এর জন্য তিনি সর্ববিধ দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করেন, এমন কি আত্মবিসর্জনেও অবিচলিত থাকেন। সুগভীর প্রত্যয় ও অচল নিষ্ঠার সহিত কবি এই মহৎ জীবনাদর্শকে মূর্ত করে তোলেন। তিনি যেন স্থিতপ্রজ্ঞ ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা (মহাকবি সম্পর্কে এই ধারণা অন্তত আমাদের পূর্বপুরুষেরা পোষণ করতেন), এবং অবলীলাক্রমে তিনি বিগত গৌরবের ছায়া বর্তমান ও অনাগত কালের উপরে প্রক্ষিপ্ত করতে পারেন। সেইজন্য মহাকাব্যের আবেদন চিরকালীন :

যে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে। (রবীন্দ্রনাথ : 'পুরস্কার'।)

মহাকাব্যের আখ্যানভাগ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় 'দেবদেবীর দ্বারা। দেবতারা অনেক সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য দেব ও মানবের মধ্যস্থিত সীমারেখা সর্বত্র খুব স্পষ্ট অনুভূত হয় না। দেবদেবীরা যেন মানব-মানবীর স্তরে নেমে এসেছেন আর যারা নরদেহধারী তারা দেবত্বলাভ করেছে। এই অতিপ্রাকৃতের অবতারণাও (মহাকাব্যের এটি একটি বিশেষ অঙ্গ) মহাকাব্যকে বিশালতা দান করেছে।

ছন্দ ও ভাষারীতির মধ্যেও বিরাটত্বের ব্যঞ্জনা রয়েছে। ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে ওজোগুণ—যা আমরা স্পষ্ট অনুভব করি গ্রীক হেক্সামিটার-এ, সংস্কৃত শ্লোকে ও অনুষ্টুভ্ ছন্দে, ইংরেজী ব্ল্যাঙ্ক ভার্স-এ ও মধুসূদনপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে। ভাষারীতির শ্রেষ্ঠ গুণ উপমার ঐশ্বর্য। উপমাপ্রয়োগের সাধারণ উদ্দেশ্য উপমেয়ের কোনো বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করা, কিন্তু এখানে উপমানই বর্ণ ও রেখায় এত সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে উপমেয়কে মনে হয় তার ম্লান পশ্চাৎপট। উপমাবাহুল্যের ফলে কাহিনীর গতিরোধ হয়, কিন্তু আবেগের গভীরতা ও বিস্তৃতি অনেক বেড়ে যায়। 'ইলিয়ড' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—এখানে পলায়মান অ্যাকিলিসের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে :

As when a man
From some dark-water'd spring through trenches leads,
'Mid plants and gardens, th' irrigating stream,
And, spade in hand, th' appointed channel clears ;
Down flows the stream anon, its pebbly bed
Disturbing ; fast it flows with bubbling sound,
Down the steep slope, o'ertaking him who leads.

মহাকাব্যকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—'অকৃত্রিম' বা স্বতঃস্ফূর্ত এবং 'সাহিত্যিক'। বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমরের রচনা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। 'মহাভারত' বা 'ওডিসি' সমাজমানসের অকৃত্রিম আলেখ্য হতে পারে, কিন্তু এখানেও শিল্পীর নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তবুও এই শ্রেণীবিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলি, যেমন ভার্জিলের 'ইনিড', ট্যাসোর 'জেরুসালেম লিবারেতা', কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', ফারদৌসির 'শাহনামা', মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' কাব্যগুণে যতই সমৃদ্ধ হোক, মহাভারত ইত্যাদির সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে না। ভার্জিল, মিলটন প্রমুখ লেখকেরা উচ্চস্তরের শিল্পী, কিন্তু তাঁদের রচনায় সজ্ঞান প্রয়াসের চিহ্ন বর্তমান, এবং সেই কারণে তাঁরা আমাদের ততটা বিহ্বল করতে পারেন না যতটা পারেন প্রাচীন মহাকবিরা। 'প্যারাডাইজ লস্ট'এর যা বিষয়বস্তু—অর্থাৎ মানুষ ও তার স্রষ্টার সম্পর্ক—তা স্বমহিমায় ভাস্বর—এবং মিলটনের অসামান্য কল্পনাশক্তি ও কলানৈপুণ্য সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ জাগে না, কিন্তু তবুও যে তিনি চরম সাফল্য লাভ করতে পারেন নি তার কারণ সম্ভবত এই যে তিনি যুগধর্মের প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি সুদূর অতীতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক জগতের সঙ্গে সেই অতীত দিনের কোনো আত্মিক যোগ ছিল না। পক্ষান্তরে হোমর, বাল্মীকি ও ব্যাস যে সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার সঙ্গে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের জীবনবেদে আন্তরিক প্রতীতির সুরই ধ্বনিত হয়েছে। সেইজন্য তাঁদের রচনাতে যা স্বাভাবিক পরবর্তী মহাকাব্যে তা-ই অস্বাভাবিক মনে হয়।

মহাকাব্যের খুব দূর আত্মীয় কাহিনীমূলক কবিতা। কাহিনী গৃহীত হয় ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদন্তী, মহাকাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং কল্পনার বর্ণপ্রলেপ দিয়ে তাকেই মনোরম করে তোলা হয়। এই শ্রেণীর কবিতাতে সাধারণত রোমান্টিক উচ্ছ্বাস থাকে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'কর্মদেবী', নবীনচন্দ্র

সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস', অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী', স্কটের 'লে অব দি লাস্ট মিনস্ট্রেল' ও 'মারমিয়ন' আখ্যানমূলক কাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত কবিতাবলীর, এবং কিটসের 'ইভ অব সেণ্ট অ্যাগনিস', 'ইসাবেলা' ও কোলরিজের 'ক্রিস্টাবেল'এর পরিসর অনেক কম কিন্তু কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট।

রূপক (Allegory)

রূপক কবিতাও আখ্যানমূলক। এর বিশেষত্ব এই যে আক্ষরিক অর্থ ছাড়া অন্য একটি গভীর অর্থের ইঙ্গিত থাকে। অর্থটি আপাত-প্রতীয়মান নয়, কবির অস্পষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করে একে খুঁজে বার করতে হয়। প্রাচীন ইউরোপীয় কাব্যে বিশদ রূপকের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। রূপকরীতি প্রথম ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় মধ্যযুগের শেষার্ধে, এবং ঐ সময়ে ইউরোপব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে ফরাসী কবি গিলোঁ দে লরিস ও জঁা দে মিউঁ রচিত কাব্যগ্রন্থ 'রোমাঁ দে লা রোজ'। গোলাপ এখানে কবিপ্রিয়ার প্রতীক, ফুলটি যে উদ্যানের মধ্যমণি তা কবির স্বপ্নদৃষ্টিতে প্রতিভাত হল মে মাসের এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে। কবিতার সূচনা এই স্বপ্নদর্শনে এবং গূঢ় অর্থের গোলকধাঁধারও শুরু এইখানে।[৩]

রূপক আধ্যাত্মিক বা নৈতিক ভাবেরও দ্যোতক হতে পারে। দান্তের বিশ্ববিশ্রুত 'ডিভাইন কমেডি' সম্পূর্ণ রূপকধর্মী না হলেও আধ্যাত্মিক সংকেতময়তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। স্পেনসারের 'ফেয়ারি কুইন'এও মধ্যযুগীয় ধর্ম ও নীতিপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। ফেয়ারি কুইন একাধারে রানী এলিজাবেথ ও গৌরবের চিন্ময়ী প্রতিমা, এবং তাঁর অনুগত নাইটেরা পবিত্রতা, সংযম ইত্যাদি মহৎ গুণের প্রতীক।

৩। ইংরেজ কবি চসার ফরাসী কবিতাটির ভাবানুবাদ করেন। তাঁর প্রথম বয়সের প্রায় সমস্ত রচনাতে রূপকরীতি অবলম্বিত হয়েছে।

হেমচন্দ্রের 'আশাকানন' ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রূপকধর্মী কাব্য। 'আশাকানন'কে হেমচন্দ্র নিজেই বলেছেন 'সাঙ্গ রূপক কাব্য'। 'মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য।' কিন্তু প্রবৃত্তিগুলিকে 'প্রত্যক্ষীভূত' করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হেমচন্দ্র কোনো দিনই তা অর্জন করতে পারেন নি, এবং সেইজন্য তাঁর রূপক রচনার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' অপেক্ষাকৃত সফল রচনা। রবীন্দ্রনাথের মতে এটি 'যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য'।

রূপক সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা দরকার। যে কোনো রচনারই একটা মনগড়া অর্থ দাঁড় করানো যায়। কিন্তু সেই অর্থ যদি কবির স্বীকৃতিলাভ না করে কিংবা তার সমর্থনসূচক কোনো ইঙ্গিত রচনার মধ্যে না থাকে তাহলে অর্থটিকে বর্জন করাই শ্রেয়।[৪] স্থানে অস্থানে রূপক আবিষ্কারের চেষ্টা করলে আসল অর্থকে বিকৃত করা হবে।

গীতিকাব্য (Lyric)

গীতিকাব্য বলতে আমরা বুঝি কাব্যগুণান্বিত গান অথবা গীতিমূলক ছোট কবিতা। ইংরেজী 'লিরিক' শব্দ এই দ্বিবিধ অর্থেই প্রযুক্ত হয়। পুরাকালে বীণা (lyre) সংযোগে এই ধরনের গান গাওয়া হত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'লিরিক'। এখন লায়ারের আর চলন নেই, তবুও সংগীতের সঙ্গে গীতিকবিতার যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা একাধারে কবিতা ও গান, এবং গানের সুরও তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি। এ দিক দিয়ে তিনি অতুলনীয়, তবে প্রসঙ্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল

৪। প্রথম অধ্যায় বিভাগ ৯-এ 'কচ ও দেবযানী' সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ইসলামের দানও স্মরণীয়। আবার সংগীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়েও অনেকে উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা রচনা করেছেন।[৫]

গীতিকবিতার সাংগীতিক আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। কাব্যবিচারে 'গীতি' শব্দাংশটি কিন্তু অর্থহীন নয়। এর দ্বারা ব্যঞ্জিত হয় কবির সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ এবং এই হৃদয়াবেগের শিল্পসম্মত প্রকাশই গীতিকবিতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ। প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে, তবুও মূল সূত্রটির এখানে পুনরুল্লেখ করছি: আত্মগত হয়েও কবি যদি আপেক্ষিক নৈর্ব্যক্তিকতার পরিচয় দিতে না পারেন তাহলে তাঁর প্রকাশকার্য সফল হবে না। যাঁদের মন সম্পূর্ণ অদমিত (uninhibited) তাঁরা অবশ্য একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না। আবেগের উচ্ছ্বাস এঁদের রচনার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা এনে দেয়। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ " 'সারদামঙ্গল' একান্তভাবে 'সাবজেকটিভ', অর্থাৎ আত্মগত, অন্তরঙ্গ কাব্য। এখানে কবিকল্পনা যেমন বাষ্পোদ্বেল ও পরিবর্তনশীল, কাব্যকল্পনাও তেমনি অবাস্তব ও উদ্বায়ু।…কবিচিত্তের সুনিবিড় রসোপলব্ধি কাব্যটির নীহারিকাবৎ উপাদান। রসাবেগ মাঝে মাঝে অত্যন্ত প্রবল হইয়া ভাবকে একেবারে ঝাপসা করিয়া দিয়াছে"।[৬]

সার্থক লিরিকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সর্বাঙ্গীণ সংহতি, এবং 'সারদা-মঙ্গলে' তারই অভাব ঘটেছে। গীতিকাব্যরচয়িতার কাছে এই সংহতিসৃজন তেমন গুরুতর সমস্যা নয়, কারণ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু একটি বিশেষ হৃদয়াবেগ—যা জটিল হলেও সাধারণত কোনো রকম ভাববৈষম্যের সৃষ্টি করে না। সুতরাং কবি যদি নিজেকে একটু সংযত করে রাখেন তাহলেই তিনি অন্তরস্থ অস্পষ্ট ভাবকে স্বচ্ছ আলোকে

৫। টেনিসন ও ইয়েটস উচ্চশ্রেণীর গীতিকাব্যরচয়িতা, কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে দুজনেই ছিলেন অরসিক। ইয়েটস আইরিশ ও ইংরেজী জাতীয় কবিতার পার্থক্য বুঝতে পারতেন না।

৬। সুকুমার সেন: 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস': দ্বিতীয় খণ্ড।

উদ্ভাসিত করতে পারবেন। ঐক্যসৃষ্টির চেয়ে বৃহত্তর সমস্যা এখানে অতি পুরাতন ভাবকে নব কলেবর দান করা। পাঠকের সাড়া যাতে গতানুগতিক না হয় সে দিকে কবির লক্ষ্য থাকা দরকার। কি উপায়ে কবি তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করেন তার সঠিক বিবৃতি দেওয়া অসম্ভব। তবে মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে লিরিক-প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় গ্রন্থিবহুল হৃদয়াবেগের সুষম প্রকাশে। আর কবিতা যখন একটিমাত্র সরলরেখা ধরে চলে তখন তার অর্থঘনত্ব নির্ভর করে ভাবের অনন্যতা ও সংকেতময়তার উপর।

লিরিকের ভাষা ও ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ভাবের অনুগামী এবং ভাবের উত্থানপতন নির্দিষ্ট হয় মিল, ছন্দস্পন্দ এবং স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ধ্বনির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দ্বারা। 'ওড টু দি ওএস্ট উইণ্ড'এ শেলি যখন স্তব্ধ, স্বপ্নাবিষ্ট ভূমধ্যসাগরের বর্ণনা দিচ্ছেন তখন তাঁর ভাষা কোমল ও সুললিত :

He lay,
Lulled by the coil of his crystalline streams.

আবার কয়েক ছত্র পরে বাত্যাক্ষুব্ধ আতলান্তিক মহাসমুদ্রের বর্ণনায় তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে মাধুর্যগুণের পরিবর্তে ওজোগুণ পরিস্ফুট হয়েছে :

The Atlantic's level powers
Cleave themselves into chasms.

লিরিক রূপকল্পও একান্তভাবে আবেগনির্ভর। 'সুচেতনা' কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশ নাগরিক জীবনের পটভূমিতে যে নির্জন দ্বীপের চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে তাঁর প্রেমাবেগই স্পন্দিত হয়েছে :

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।

গীতিকাব্যের ঐতিহ্য সব দেশেই খুব প্রাচীন। ভারতীয়, চৈনিক, ইহুদী ও গ্রীক গীতিকাব্যের প্রাচীনত্ব অবশ্য সবচেয়ে বেশী।

সাল-তারিখের প্রশ্ন না তুলে আমরা দু-চার কথায় এই সব বিভিন্ন লিরিকের একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। চৈনিক গীতিকবিতার ভাববস্তু প্রধানত প্রেম, বন্ধুত্ব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুরাগ। ভাবের স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা এবং রূপকল্পনার সংযত ও সমঞ্জস প্রয়োগ চৈনিক গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে :

কামিজ খুলে সবুজ বনে এসে বসি,
আস্তে আস্তে চালাই একটা পাখা,
মাথার টুপি খুলে রেখে দিই একটা পাথরের 'পরে
পাইন গাছ থেকে হাওয়া ঝরে পড়ে
আমার খালি মাথার উপরে।

আদি গ্রীক গীতিকবিতা সংগীতের সমগোত্র। দু-রকম কবিতার প্রচলন ছিল—'কোর‍্যাল' (মিলিত) ও 'মনডিক' (একক)। কোর‍্যাল কবিতা নাটকের অন্তর্গত, এবং এর সাহায্যে ইসকিলাস, সফোক্লিস প্রভৃতি লেখক নাটকীয় পরিস্থিতিকে অত্যন্ত আবেগময় করে তুলেছেন। মনডিক কবিতা বিষয়বৈচিত্র্য, অনুভূতির সূক্ষ্মতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। স্যাফো (সুইনবার্নের মতে সর্বোত্তম গ্রীক গীতিকাব্যরচয়িতা) ও পিনডার মনডিক লিরিক রচনায় সমধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ইহুদী গীতিকাব্য ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত। ওল্ড টেস্টামেন্টের 'সং অব সংস্' অথবা 'বুক অব সাম্‌স্'এ যে আধ্যাত্মিক উন্মাদনা ও অসামান্য প্রকাশক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্বসাহিত্যে কদাচিৎ তার তুলনা মেলে। ভারতীয় আদি গীতিকাব্যও—অর্থাৎ ঋক্ ও অথর্ব বেদের অন্তর্গত সংগীতাবলী—আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন, তবে জার্মান সমালোচক উইনটারনিজের মতানুসারে আমরা বলতে পারি যে বৈদিক কবি যেন সূর্য, চন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের বন্দনা গান করেন নি। তিনি ভাস্বর সূর্য, দীপ্তিমান চন্দ্র, নক্ষত্রখচিত আকাশ, বিদ্যুৎশিখা, বৃষ্টিধারা, জলপ্রবাহ ইত্যাদি মহিমময় প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই বর্ণনা করেছেন।[৭] সংস্কৃত ক্লাসিক গীতিকাব্যে

৭। পরবর্তী উপবিভাগে আলোচিত 'প্রার্থনাসংগীত' দ্রষ্টব্য।

লৌকিক ভাব অধিকতর বিকাশলাভ করেছে। এবং বিশেষ করে দরবারী কবিতাতে দৈহিক অনুভূতি অসংবৃতরূপে প্রকাশ পেয়েছে। অনেক কবিতাতে আবার শ্রীকৃষ্ণ-ঐতিহ্য অবলম্বিত হয়েছে। এদের বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক প্রতীকতা এবং লৌকিক ও অলৌকিক অনুভূতির মিলন। ছন্দোবৈচিত্র্য বিস্ময়কর, এবং কলহংস, কুসুমবিচিত্রা, প্রহর্ষিণী, মন্দাক্রান্তা, বিদ্যুন্মালা, শিখরিণী প্রভৃতি নামেই যেন কবিত্বের সংকেত রয়েছে। রোমক, ইতালীয়, পারসী (ওমর খৈয়াম, শাদি, হাফিজ), আরবী, ইংরেজী, ফরাসী গীতিকাব্যও সবিশেষ আলোচনীয়, কিন্তু পরিসরের স্বল্পতার জন্য তা সম্ভব হল না। বাঙলা কবিতা পৃথক ভাবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

প্রার্থনাসংগীত (Hymn)

প্রার্থনাসংগীত অথবা স্তোত্রপাঠ দেবতা ও ঈশ্বর উপাসনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। আধ্যাত্মিক ভাবই স্তোত্রের প্রাণস্বরূপ, এবং গায়ক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভাবের উদ্দীপনই স্তোত্রকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যমূলক হলেও অনেক স্তব কাব্যধর্মী, যেমন বৈদিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টান সংগীত। বেদরচয়িতার ধর্মবোধ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু মানব-জীবন ও পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মহিমার প্রতিও তিনি উদাসীন নন। তিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী। তাঁর কল্পনাদৃষ্টিতে 'আকাশ-দুহিতা' উষা মূর্ত সৌন্দর্য, উষার আবির্ভাবে অন্ধকার ও অমঙ্গল দূরীভূত হয়। অধ্যাত্মবোধের গৌরব স্থানে স্থানে একটু নিষ্প্রভ হয়েছে আশীর্বাদলাভের অত্যধিক কামনা প্রকাশের জন্য,—অন্তত উইনটারনিজ এইরূপ মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তিনিও অথর্ববেদের অন্তর্গত পৃথিবী ও বরুণ বন্দনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পৃথিবী দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুর রক্ষয়িত্রী, আর বরুণ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান :

> বরুণই এই পৃথিবী এবং ঐ অসীম অন্তরীক্ষের অধীশ্বর,
> দুটি সমুদ্রই বরুণের কুক্ষিগত,
> এবং তিনি এই ক্ষুদ্র বারিবিন্দুতে নিলীন।

এই সব ছত্রে যে দিব্য উন্মাদনা প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা পাওয়া যায় একমাত্র ইহুদী প্রার্থনাসংগীতে।

বেদগান ও ইহুদী সংগীতের সুর কিন্তু এক নয়। বৈদিক কবি পরমার্থিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন:

আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে আমি জেনেছি,
তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

যে প্রশান্তি ও আনন্দানুভূতির ধ্যানস্নিগ্ধ রূপ এখানে দৃষ্ট হয় ইহুদী সংগীতে তা অনুপস্থিত। নির্বাসনের দুঃখ[৮] ও অত্যাচারের গ্লানি ইহুদীদের প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ করেছিল। এবং সেইজন্য তাঁদের প্রতিভূস্থানীয় কবিদের রচনায় বৈরনির্যাতনের প্রবৃত্তি এবং ব্যক্তি ও জাতির মুক্তিকামনা ব্যক্ত হয়েছে। এই মনোভাব অবশ্য মিলিত হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত ভক্তির সঙ্গে :

My heart rejoiceth in the Lord, mine horn is exalted in the Lord; my mouth is enlarged over my enemies; because I rejoice in thy salvation.

There is none holy as the Lord; for there is none beside thee; neither is there any rock like our God. (I *Samuel* ii)

গ্রীক কবিরাও প্রার্থনাসংগীত রচনা করতেন, তবে অধিকাংশ সংগীতই আজ অবলুপ্ত। যে সব রচনা এখনও বিদ্যমান তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 'দি ফার্স্ট ডেলফিক হিম' এবং হোমারের 'হিম টু ডিমিটার', 'টু এথেনা', 'টু আর্থ' ও 'টু ক্যাস্টর ও পোলাক্স'। খ্রীষ্টান প্রার্থনাগানে ইহুদী ও গ্রীক সংগীতধারা মিলিত হয়েছে। ইহুদী প্রভাব দেখা যায় 'গ্লোরিয়া ইন এক্সেলসিস'[৯] ও 'ম্যাগনিফিক্যাত'এ, এবং গ্রীক প্রভাব 'টে ডিউম'এ।[১০] সংগীতের খুঁটিনাটি বিষয়ের

৮। ইহুদীদের দুবার দেশত্যাগ করতে হয়েছিল।

৯। 'Glory be to God on high'। এই প্রার্থনা-সংগীত খ্রীষ্টান উপাসনার অঙ্গ।

১০। রচনাকাল ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ, এবং রচয়িতা খুব সম্ভব সেণ্ট অ্যাম্ব্রোস।

আলোচনা এখানে অনাবশ্যক—এবং আমাদের সাধ্যেরও অতীত। চার্চ সংগীতের শ্রেণীবিভাগও খুব গোলমেলে—যেমন ক্যানটিকল্‌, চ্যাণ্ট, সিকোয়েন্স, অ্যানটিফোন ইত্যাদি। সাংগীতিক রহস্য ভেদ করার চেষ্টা না করে আমরা অবশ্য ঈশ্বরের উপর কবির নির্ভরশীলতা, আবেগ-চাঞ্চল্য, সংঘর্ষমূলক প্রচারপ্রবণতা ইত্যাদি ভাবগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি এবং তাহলেই কাব্যগুণের উৎকর্ষ আমরা ঠিকমত বুঝতে পারব।

আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনাসংগীতের তেমন প্রচলন না থাকলেও ধর্মমূলক গানের ধারা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান। এই ধারার বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকবীর, বল্লভদাস, সুরদাস ও মীরাবাঈয়ের হিন্দী ভজন, রামদাস ও তুকারামের মারাঠী ভজন এবং বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী, শ্যামাসংগীত ও বাউল গান। এই সমস্ত গান ভক্তি, প্রেম, বিরহ, বাৎসল্যাদি রসে অভিষিক্ত, এবং সেইজন্য জনসাধারণের মধ্যে এদের আবেদন খুব ব্যাপক। সাধারণ অনুভূতির এখানে উর্ধ্বায়ন হয়েছে—যেমন, বৈষ্ণব কবিতায় 'সখ্য, বাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম… শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে।'[১১] কিন্তু এই 'লীলাবৈচিত্র্যের' মধ্যে মানুষের হৃদয়াবেগ নিঃশেষ হয়ে যায় নি, এবং বলা বাহুল্য সেই কারণেই বৈষ্ণব কবিতা ধর্মপথের নির্দেশক হয়েও এত মর্মস্পর্শী। ভক্তের দৃষ্টিতে চণ্ডীদাসের সুপরিচিত গান 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' নিশ্চয়ই অধ্যাত্মবোধের অভিব্যক্তি, কিন্তু রসিক পাঠকের নিকট শ্রীরাধার 'আক্ষেপানুরাগ' কবির বিরহী হৃদয়েরই প্রতিভাস।

আমাদের ভক্তিবাদের সঙ্গে মরমিয়া তত্ত্বের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়, এমন কি একটিকে অপরের নামান্তর বললে সত্যের অপলাপ হবে না। খ্রীষ্টান মরমী ও মুসলমান সুফী[১২] সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ধর্মগ্রন্থোক্ত

১১। দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী'র ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

১২। সুফী মতের প্রবর্তন হয় আরব দেশে, কিন্তু এর উদ্গাতা ছিলেন পারস্যদেশীয় কবি সানাই, আত্তার ও জালাল উদ্দীন মৌলভী রুমি। মুসলিম জগতে রুমিই শ্রেষ্ঠ মরমী কবি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনতত্ত্বের পরিপূর্ণ উপলব্ধি, কিন্তু তাঁদের পথ প্রেমানুভূতির, জ্ঞানের নয়, এবং এই হিসাবে অধ্যাত্মমার্গে তাঁরা চৈতন্য, মীরাবাই প্রভৃতির সহযাত্রী। এঁদের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। মরমীয়া কাব্য সেইজন্য তত্ত্বমূলক নয়, কবির ধর্মপ্রবণ হৃদয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই এর প্রাণ। অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে নিরন্তর বিচলিত করে, এবং সে দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে পরম সত্তায় তাঁর আত্মবিলোপে। ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি এখন একাত্মা।

But as I raved and grew more fierce and wild
At every word,
Methought I heard one calling, *Child* :
And I replied, *My Lord.* (George Herbert : 'The Collar')

মরমী কবি হিসাবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে হার্বার্ট, রিচার্ড ক্রশ, ফ্র্যান্সিস টমসন, জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স ও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য। অনেকে আবার (যেমন হেনরি ভন, ওআর্ডসওআর্থ—এবং রবীন্দ্রনাথও) বহিঃপ্রকৃতি থেকে প্রেরণা আহরণ করেছেন, এবং তাদের রচনাতেও ঐকাত্ম্যবোধ খুব স্পষ্ট।

ওড (Ode)

ওড (এর কোনো বাঙলা প্রতিশব্দ নেই) লিরিক-প্রতিভার আর একটি সুন্দর অভিব্যক্তি। ক্লাসিক ওড রচিত হত কোর‍্যাস গান হিসাবে। এর পর পর তিনটি স্তবকের নাম স্ট্রোফি (Strophe), অ্যানটিস্ট্রোফি (antistrophe) ও এপোড (epode)। কোরাস অর্থাৎ গায়কবৃন্দ প্রথমে বাঁ দিকে ও পরে ডান দিকে ঘুরে যথাক্রমে স্ট্রোফি ও অ্যানটিস্ট্রোফি গাইত। এপোড গাওয়া হত ভিন্ন সুরে এবং তখন সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত। একই ওডে একাধিক স্ট্রোফি ইত্যাদি থাকতে পারে, কিন্তু স্তবকবিভাগ ঐ রীতির দ্বারা সুনির্দিষ্ট। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ওডে তিনটি স্তবক একত্র গ্রথিত হয়ে একটি বিভাগ রচনা করে।

ওড রচনায় সর্বাধিক দক্ষতা দেখিয়েছেন গ্রীক কবি পিনডার। তিনি লেখনী চালনা করতেন অনেকটা দিব্য প্রেরণার বশে। পুরাণ কিংবদন্তীতে তাঁর শিশুসুলভ বিশ্বাস ছিল, এবং সেইজন্য তাঁর রচনাতে, বিশেষত 'এপিনিসিয়া'র অন্তর্গত 'অলিম্পিয়ান ওডস'এ একটা সহজ প্রত্যয়ের সুর শোনা যায়। তা ছাড়া ভাবের অচিন্তনীয় মহত্ত্ব ও লোকোত্তর কল্পনার দীপ্তিচ্ছটাও আমাদের মনোরঞ্জন করে। রোমক কবি হোরেসও পিণ্ডারীয় রীতি অনুসারে 'টু দি শিপ ইন হুইচ ভার্জিল সেল্ড্ টু এথেন্স', 'টু মিসেনাস', 'কান্ট্রি লাইফ' প্রভৃতি ওড রচনা করেন, এবং এই কবিতাগুলির প্রধান গুণ ভাবের স্বচ্ছতা এবং ভাষা ও ছন্দের বিশুদ্ধতা। পারস্যদেশীয় কবি হাফিজের ওডও অনবদ্য সৃষ্টি। এমারসনের মতে তিনি পিণ্ডার, অ্যানাক্রিয়ন (গ্রীক কবি), হোরেস ও বার্নসের বিশিষ্ট গুণের সঙ্গে যোগ করেছেন মরমীর অন্তর্দৃষ্টি। প্রেমানুভূতির যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যে দেখা যায় অন্যত্র তা অতিশয় দুর্লভ :

খুশির আলো মুখে নিয়ে যারা মৃত্যু বরণ করেছে
তারা ভালোবাসার নির্মম রহস্য কি জানে—
যে-ভালোবাসা বানিয়েছে আমাকে ক্ষুব্ধ আহাম্মুক ?
হাফিজ আহাম্মুক ! হ্যাঁ, সবার সেরা আহাম্মুক।

আধুনিক যুগে ইংরেজী ভাষায় বহু ওড লিখিত হয়েছে, এবং অন্য লিরিকের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এর ভাব, বিষয় ও কাব্যশৈলী উন্নত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। ছত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে অসমান অর্থাৎ ধ্বনি-সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ানো কমানো হয়। এর দৃষ্টান্ত ওআর্ডসওআর্থের 'ওড অন দি ইনটিমেশনস অব ইমর্টালিটি'। ওড রচনায় অনেক ইংরেজ কবিই সফলকাম হয়েছেন, যথা ড্রাইডেন, কোলরিজ, শেলি, কিটস প্রভৃতি। গ্রে ও কলিন্স পিণ্ডারীয় রূপকলার অনুকরণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কবিতাগুলিতে—যেমন গ্রের 'প্রোগ্রেস অব পোএসি' ও 'বার্ড' এবং কলিন্সের 'ওড টু লিবার্টি'তে—আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা দোষ দেখা যায়।

বাঙলা ভাষায় 'ওড' শব্দের প্রচলন নেই, তবে লক্ষণ বিচার করে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী', 'শাজাহান', 'শিবাজী-উৎসব', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নমস্কার' ও মোহিতলাল মজুমদারের 'পান্থ' ('দার্শনিক সন্ন্যাসী সোপেনহায়ারের উদ্দেশে' লিখিত অংশ) প্রভৃতি কবিতাকে স্বচ্ছন্দে 'ওড' আখ্যা দিতে পারি।

শোককবিতা (Elegy)

'এলিজি'র প্রচলিত অর্থ শোকসূচক কবিতা, কিন্তু কেবল এই অর্থে গ্রীক কবিরা শব্দটি (গ্রীক 'pros') প্রয়োগ করতেন না। এলিজির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারিত হত একটি বিশেষ ছন্দের দ্বারা (একে বলা হত 'এলিজিয়াক মিটার')। কবিতার ভাববস্তু যাই হোক—প্রিয়জন-বিয়োগব্যথা, যুদ্ধপ্রীতি অথবা প্রেমাবেগ—ঐ ছন্দ প্রয়োগ এলিজি রচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। এলিজি লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন মিমনেরমাস, অ্যানাক্রিয়ন ও একেমব্রোটাস। লাতিন কবিরা—যথা তিবিউলাস, ওভিদ ও প্রপারতিয়াস—মোটামুটি গ্রীক ঐতিহ্যেরই বাহক ছিলেন।

শোকসূচক কবিতারও প্রকারভেদ আছে। সাধারণ এলিজির সংজ্ঞানিরূপণ নিষ্প্রয়োজন। আর একটি বিশেষ প্রকারের কবিতাকে বলা হয় প্যাসটোর‍্যাল এলিজি। এতে মৃত ব্যক্তি মেষপালকরূপে কল্পিত হয় এবং তার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে তার সহচরবর্গ এবং বাহ্য প্রকৃতি। এইজাতীয় এলিজির উদ্ভাবক বিউকোলিক (গ্রীক) কবি বিয়োন। 'ল্যামেণ্ট ফর অ্যাডোনিস'এ তিনি এই নূতন রীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত 'ল্যামেণ্ট ফর বিয়োন' আর একটি বিখ্যাত প্যাসটোর‍্যাল এলিজি। এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে স্পেনসারের 'অ্যাস্ট্রোফেল', মিলটনের 'লিসিডাস', শেলির 'অ্যাডোনাইস' ও আর্নল্ডের 'থারসিস'এ। মিলটন ও শেলি একটি নূতন সুর ঝংকৃত করেছেন,—সে সুর আশা ও আনন্দের, মৃত্যুর অন্ধকার অবলুপ্ত হয়েছে অমরত্বের আলোকে :

So Lycidas sunk low, but mounted high,
Through the might of Him that walk'd the waves.

(মিলটন)

He lives, he wakes—'Tis death is dead, not he.

(শেলি)

'লিসিডাস' ও 'অ্যাডোনাইস' শ্রেষ্ঠ ইংরেজী শোককবিতা, তবে সব চেয়ে জনপ্রিয় কবিতা সম্ভবত গ্রের 'এলিজি রিট্‌ন্ ইন এ কান্ট্রি-চার্চইয়ার্ড'। গ্রে কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন নি। এক অখ্যাত পল্লীর অখ্যাততর মৃত অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন এবং সাধারণভাবে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা ও জীবনের নশ্বরতা ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়ম'ও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, তবে কবিতাটি এতই দীর্ঘ যে একে এলিজি না বলে এলিজিগুচ্ছ বলা অধিকতর সংগত। দীর্ঘ কবিতার মতো অতি ক্ষুদ্রায়তন রচনাও এলিজি-আখ্যেয় নয়।[১৩]

রসোত্তীর্ণ বাঙলা শোককবিতার সংখ্যা খুব বেশী নয়। কোনো বরেণ্য ব্যক্তির তিরোধানে অনেকেই শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁদের কাব্যপ্রচেষ্টার আবেদন অত্যন্ত স্বল্পকালস্থায়ী। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' ও 'এবে কোথায় চলিলে ?' (রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত), নবীনচন্দ্র সেনের 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বন্ধুবিয়োগ' (তিন বন্ধু কৈলাস, বিজয় ও পূর্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ) ইত্যাদি রচনা নিতান্তই বিশেষত্ব-বর্জিত। নবীনচন্দ্রের শ্রদ্ধানিবেদনে অবশ্য আন্তরিকতার একটু স্পর্শ পাওয়া যায় :

যাও তবে কবিবর কীর্তিরথে চড়ি
বঙ্গ আঁধারিয়া
যথা বাল্মীকি ব্যাস ভবভূতি কালিদাস
রহিয়াছে সিংহাসনে তোমারি লাগিয়া।

১৩। অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন শোককবিতার নাম ডার্জ (dirge)। উদাহরণ, শেক্সপিয়রের 'ফিয়ার নো মোর দি হিট অব দি সান' ('সিম্বেলিন'), 'ফুলক্যাদম

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' সর্বোৎকৃষ্ট বাঙলা শোককবিতা। প্যাসটোর‍্যাল বা অন্য কোনো পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন নি, তবুও স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথ ও শেলির কবিতার মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শোকাহত মূর্তি কল্পনা করেন নি যেমন শেলি করেছিলেন প্রাচীন রীতি অনুসারে, তাহলেও অ্যাডোনাইসের

Morning sought
Her eastern watch-tower, and her hair unbound,
Wet with the tears which should adorn the ground,
Dimmed the aerial eyes that kindle day.

প্রভৃতি ছত্রের সহিত উপমিত হতে পারে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে'র এই কয়েকটি চরণ :

কবি, আজি হতে সে (শরৎ) কি
বারে বারে আসি তব শূন্য কক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশিরসিক্ত পুষ্পগুলি
নীরবসংগীত তব দ্বারে।

তা ছাড়া কিটসের (যাঁর মৃত্যুতে 'অ্যাডোনাইস' রচিত হয়েছিল) মতো সত্যেন্দ্রনাথও মরণজয়ী :

সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি মর্ত্যকবি, মুহূর্তের মাঝে।

কবিতা দুটির বৈলক্ষণ্যও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের দুঃখবোধ যতটা আন্তরিক শেলির ঠিক ততটা নয়।[১৪] আবার শেলি যে তুরীয় প্লেটোনিক ভাব ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তার আভাসটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন।

ফাইভ দাই ফাদার লিভস' (টেমপেস্ট), ওআর্ডসওআর্থের 'এ স্লাম্বার ডিড মাই স্পিরিট সিল' ইত্যাদি।

১৪। শেলি ও কিটসের মধ্যে তেমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না, যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে।

সনেট

সনেট শব্দটির অর্থ 'মৃদু ধ্বনি' এবং বাঙলায় এর যা নামকরণ হয়েছে—চতুর্দশপদী কবিতা—তাতে এই কাব্যরূপের অন্তত একটি বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়েছে—পংক্তিসংখ্যা। সনেটের রূপকলা সম্পূর্ণরূপে রীতিবদ্ধ। চরণসংখ্যার মতো সনেট-ছন্দও সুনির্দিষ্ট। মিলের সূত্র এইরূপ: কখখক কখখক গঘঙ গঘঙ। প্রত্যেকটি অক্ষর এখানে মিলের সংকেত। প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম চরণ সমমিলবিশিষ্ট, এবং এইটি জ্ঞাপিত হয়েছে 'ক' অক্ষরের দ্বারা। 'খ', 'গ' ইত্যাদির অর্থও এইভাবে গ্রহণ করতে হবে। শেষ ছয় পংক্তিতে অন্য রকম মিল থাকতে পারে, যথা গঘগ ঘগঘ ; গঘ গঘ গঘ ; গঘঘ ঘগঘ ; গঘঙ ঙঘঙ। এই ছন্দকে বলা হয় ইতালীয় বা ক্লাসিক ছন্দ।

ইতালিই সনেটের উৎপত্তিস্থান, তবে এর প্রসার ঘটে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, এবং ইউরোপের বাইরে অন্য দেশেও। ইতালির শ্রেষ্ঠ সনেট-রচয়িতা দান্তে ও পেত্রার্ক, এবং ইংলণ্ডে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন তাঁদেব মধ্যে শেক্সপিয়র, মিলটন ও ওআর্ডসওআর্থের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। ইংরেজ কবিরা প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেন। ক্লাসিক সনেটে দুটি সুচিহ্নিত অংশ থাকে—অষ্টক (octave) অর্থাৎ প্রথম আট ছত্র এবং ষট্‌ক (sestet) অর্থাৎ শেষ ছয়টি চরণ। যে ভাব নিয়ে কবিতাটি শুরু করা হয় তাতে একটু ছেদ পড়ে অষ্টম চরণের পরে এবং এইখানে কবি অন্য (কিন্তু প্রথম ভাবের সহিত সংস্পৃষ্ট) ভাবের অবতারণা করেন। ইংরেজী সনেটে অনেক সময় এ রকম কোনো ছেদ থাকে না। মিলটন ক্লাসিক পদ্ধতির অনুগামী ছিলেন, কিন্তু তাঁর সনেটেও ঐ ছেদরীতি পালিত হয় নি। কখনও কখনও অবশ্য কবিতার শেষ দুই পংক্তিতে ভাবের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এটি ক্লাসিক পদ্ধতির অনুসরণ নয়, কবিতাকে সমগ্রতা দান করার জন্য ঐ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। মিলটন মোটামুটি ক্লাসিক ছন্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী সনেটে আর এক রকম মিলের বহুল প্রচলন দেখা যায়—কখকখ গঘগঘ

ডচডচ ছন্দ। বলা বাহুল্য এই পদ্যবন্ধ ইতালীয় রীতির তুলনায় অনেকটা স্বচ্ছন্দ।

সনেট একান্তভাবে গীতিকাব্যধর্মী। ওডের মতোই সনেট ভাব-গম্ভীর এবং ছন্দোবন্ধন সত্ত্বেও আবেগচঞ্চল। সনেটরচনানৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষ দেখা যায় দান্তে, পেত্রার্কে, শেক্সপিয়র ও মিলটনের কবিতাতে। ব্লেক ধূলিকণার মধ্যে অনন্তের আভাস পেয়েছিলেন, এখানেও চতুর্দশপদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আমরা যেন সীমাহীন বিস্তৃতি অনুভব করি।

মধুসূদন বাঙলা কাব্যে প্রথম সনেটের প্রবর্তন করেন। তাঁর খ্যাতি শুধু প্রবর্তক হিসাবেই নয়, উচ্চস্তরের সনেট-রচয়িতা হিসাবেও। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নিঃসন্দেহে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি তাঁর ব্যক্তিমানসের বাঙ্ময় চিত্র। এর ছন্দোরীতি সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন: 'পেত্রার্কের সনেটের বাহ্যিক গঠন অনুসারে মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখেন নাই, যদিও সর্বসমেত ১০২ কবিতার মধ্যে তেতাল্লিশটিতে পেত্রার্কের অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ হইয়াছে (কখ কখ কখ কখ+গঘ গঘ গঘ)। মধুসূদন এ বিষয়ে মিলটনেরই অনুকরণ করিয়াছিলেন। মিলটনের অষ্টকে দুইটি মিল, মধুসূদনেরও তাই। মিলটনের ষট্‌কে দুইটি বা তিনটি মিল, মধুসূদন তাই করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের হাতে সনেট আরও শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে। পুরাতন চোদ্দ অক্ষরের পয়ারকে তিনি অনেকটা অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো প্রয়োগ করেন ('নৈবেদ্য', চৈতালি' ইত্যাদিতে), তা ছাড়া তিনি আঠারো অক্ষরের দীর্ঘ পয়ারের উদ্ভাবন করেন ('পুরবী'র অন্তর্গত সমুদ্রবিষয়ক সনেটগুলি)। রাবীন্দ্রিক এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে আরও অনেক বিশিষ্ট কবি—যথা প্রমথ চৌধুরী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত—সনেটকে নানা-ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

ব্যালাড

'ব্যাল্যাড' (ballad), 'ব্যালাড' (ballade : 'আ'এর উচ্চারণ দীর্ঘ) ও 'ব্যালে' (ballet)—এই তিনটি শব্দেরই উৎপত্তি হয়েছে ইতালীয় 'ballare' থেকে। Ballareএর অর্থ 'নৃত্য করা'। সুতরাং ব্যালাড ইত্যাদির সঙ্গে যে নৃত্যের সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি। তা হলেও শব্দ তিনটি সমার্থক নয়। ব্যাল্যাড ও ব্যালে—দুইই নৃত্য ও কাহিনী সংবলিত গান, কিন্তু ব্যালেতে নৃত্যের মাত্রা অত্যন্ত প্রবল, এবং কাহিনী পরিবেশিত হয় নাটকীয় ভাবে। একাধিক ব্যক্তি এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ব্যাল্যাডের ভঙ্গিও নাটকীয়, তবে এর পরিবেশক মাত্র একজন, এবং নৃত্যের চেয়ে সংগীতে তিনি অধিকতর পারদর্শী। ব্যালাড নৃত্য ও গীতিমূলক, কিন্তু কাহিনী-বর্জিত।

অনেকের মতে ব্যাল্যাডই প্রাচীনতম কাব্যরূপ। এ মত বিজ্ঞান-সম্মত কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে পুরাকালে ব্যাল্যাডের লক্ষণাক্রান্ত রচনার যে অপ্রতুল ছিল না তার প্রমাণ ঋগ্বেদবর্ণিত পুরুরবা-উর্বশী কাহিনী। এখন অবশ্য ব্যাল্যাড একটি বিশেষ পরিভাষায় পরিণত হয়েছে এবং মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে সতেরো শতকের সূচনা পর্যন্ত যে সব লিরিকধর্মী, আখ্যানমূলক লোকগাথা প্রণীত হয়েছিল সেইগুলিকে ব্যাল্যাড নামে অভিহিত করা হয়। কবিতাগুলির জন্মস্থান ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ইউরোপীয় অঞ্চল। এদের রচয়িতারা প্রায়শ অজ্ঞাতনামা। তাঁরা যেন যুগপৎ লিরিক অনুভূতি ও সমষ্টিগত চেতনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং অন্তত কতকটা এই কারণে তাঁদের রচনা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা উচিত যে ব্যাল্যাড গান করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করত।

ব্যাল্যাডের আখ্যায়িকা নানাবিষয়ক। প্রেম, ধর্ম, বীরত্ব, রাজনীতি, হাস্যরস, করুণ রস—সব কিছুই এর অবলম্বন। ইংরেজী ব্যাল্যাডের প্রধান বিষয়বস্তু আইনবিরুদ্ধ কার্যকলাপ (যেমন

রবিনহুডের দস্যুবৃত্তি), ইংরেজ ও স্কচের সীমান্তদ্বন্দ্ব ('চেভি চেজ') এবং বিয়োগান্ত অথবা মিলনান্ত প্রণয়লীলা। মধ্যযুগীয় ব্যাল্যাডের অনুকরণে আধুনিক কালে বহু কবিতা লিখিত হয়েছে—যেমন কোলরিজের 'এনসেণ্ট মেরিনার', ব্রাউনিংএর 'হাউ দে ব্রট দ্য গুড নিউজ' ও লংফেলোর 'রেক অব হেসপারাস'। কোলরিজ 'অপ্রচলিত শব্দ—যথা 'স্পিরিট'এর বদলে 'স্প্রাইট', 'এফ্‌টসুনস'—প্রয়োগ করে বিগত দিনের আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, এবং তিনি অসামান্য সাফল্যও অর্জন করেছেন। ব্রাউনিং ও লংফেলোর প্রকাশভঙ্গিও অত্যন্ত সাবলীল ও আবেগময়। তবে এঁদের প্রত্যেকেরই রচনাতে সজ্ঞান কারুনৈপুণ্যের ছাপ রয়েছে। ব্যাল্যাড-মিটার অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পুরাতন ব্যাল্যাডের প্রতি ছত্রে আছে সাতটি প্রস্বরিত ধ্বনি। আধুনিক ব্যাল্যাডে ঐ দীর্ঘ ছত্র দুটি ছত্রে পরিণত হয়েছে এবং ছত্র দুটির ধ্বনিসংখ্যা যথাক্রমে চার ও তিন। এই ছন্দকে বলা হয় রোমাণ্টিক ছন্দ। বাঙলা ভাষায় কাহিনীমূলক, নাটকীয়গুণান্বিত কবিতার অভাব নেই, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে ব্যাল্যাড বলতে যা বোঝায় তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ব্যঙ্গকাব্য (Satire)

ব্যঙ্গকাব্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনীয়, যদিও এর সঙ্গে বর্ণনাত্মক এবং কাহিনীমূলক কবিতার কিছুটা বাহ্য সাদৃশ্য রয়েছে। ইংরেজী 'স্যাটায়ার' শব্দ উদ্ভূত হয়েছে লাতিন 'satura' থেকে, কিন্তু লাতিন শব্দের মৌলিক অর্থ বিবিধ বিষয়, 'মিসলেনি'। এবং বলা বাহুল্য এই অর্থের সঙ্গে বর্তমান স্যাটায়ারের কোনো যোগ নেই। অ্যারিস্ট-ফ্যানিস প্রমুখ গ্রীক লেখকদের রচনাও বিদ্রূপাত্মক, এমন কি বাইবেলের কোনো কোনো অংশে ব্যঙ্গের আভাস আছে, তবে একটি বিশিষ্ট কাব্যরূপ হিসাবে স্যাটায়ারের প্রথম আবির্ভাব দৃষ্ট হয় লাতিন কবি লুসিলিয়াসের রচনাতে, পরে একে আভিজাত্যমণ্ডিত করেন হোরেস ও জুভেন্যাল।

ব্যঙ্গকাব্যের মুখ্য আক্রমণীয় বিষয় মানুষের রুচি অথবা নীতিগত ত্রুটিবিচ্যুতি। এই আক্রমণ হওয়া উচিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অর্থাৎ লেখকের প্রধান কর্তব্য দুষ্কৃতিকারীকে সোজাসুজি আক্রমণ না করে তার দুষ্কৃতিকে ঘৃণ্য অথবা হাস্যকর প্রতিপন্ন করা। আক্রান্ত ব্যক্তি এখানে শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিস্থানীয়। ব্যঙ্গকাব্য রচনার এই বিধিই সুপ্রচলিত। অনেকে—যেমন ইংরেজ কবি পোপ—অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের উপরও বিষোদ্গার করেছেন। কিন্তু এটা কুরুচির পরিচায়ক, এবং যিনি অপরাধের বিচারক তিনি নিজেই অপরাধী হয়ে পড়েন। কোনো কোনো রচনা অবশ্য ব্যক্তিগত আক্রমণ সত্ত্বেও ব্যঙ্গকাব্যোচিত কৌলীন্য অর্জন করেছে। ড্রাইডেনের 'ম্যাক ফ্লেকনো' এর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সমকালীন নাট্যকার টমাস শ্যাডওএল এখানে নির্মমভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কবিতাটি এতই হাস্য-রসোচ্ছল যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ মোটেই পীড়াদায়ক মনে হয় না। শ্যাডওএলের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপের পরিবর্তে একটি বিমূর্ত গুণ অর্থাৎ চরম নির্বুদ্ধিতা কবিতাটির প্রত্যেক ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেমন এক জায়গায় ড্রাইডেন বলছেন যে অপরাপর নির্বোধ কবির উপর মাঝে মাঝে বুদ্ধিরশ্মি বিকীর্ণ হয়, কিন্তু

Shadwell's genuine night admits no ray,
His rising fogs prevail upon the day.

ব্যঙ্গকাব্যে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনো দাম নেই। তাঁর সাফল্য পরিমিত হয় প্রধানত তাঁর সমাজচেতনার সংযত অভিব্যক্তির দ্বারা। আচরণসম্পর্কিত প্রচলিত সংহিতার ব্যত্যয় কিংবা কোনো সামাজিক বা অন্যবিধ কুসংস্কারের উপর তিনি কশাঘাত করেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, সে উদ্দেশ্য ঐ চারিত্রিক ত্রুটির সংশোধন বা কুসংস্কারের উৎসাদন। সাহিত্যবিষয়ক ভ্রান্ত মতেরও তিনি সমালোচনা করতে পারেন এবং এরূপ স্থলে তাঁর লক্ষ্য রুচির পরিবর্তন সাধন। মোট কথা ব্যঙ্গকাব্য সব সময়েই উদ্দেশ্যমূলক। সাধারণ

আবেগপ্রধান কবিতাতে যদি লেখকের উদ্দেশ্যপ্রবণতা প্রকাশ পায় তা হলে কাব্যগুণের হানি ঘটে, কিন্তু ব্যঙ্গকাব্য স্বভাবতই আক্রমণাত্মক, এবং ঠিক সেই কারণেই উদ্দেশ্যপ্রধান। অত্যন্ত তীব্র ও ধ্বংসাত্মক আক্রমণ অবশ্য উদ্দেশ্যহীন এবং ব্যঙ্গকাব্যের অনুপযোগী।

ব্যঙ্গকাব্যরচয়িতার প্রধান অস্ত্র উইট ও বক্রোক্তি এবং এদের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন মাত্রাজ্ঞান ও শালীনতাবোধ। হোরেস এ দিক দিয়ে আদর্শস্থানীয়। 'স্যাটায়ারস' ও কয়েকটি 'এপিসলস'এ তিনি প্রশংসনীয় আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যায়কে তিনি আক্রমণ করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং নৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের এরূপ মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন যে তাঁর রচনা কোনো প্রকার তিক্ততার সৃষ্টি না করে লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছে। জুভেন্যাল পুরোপুরি বিপরীতপন্থী। সহিষ্ণুতা বা পরিমিতিবোধ তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অপরাধীকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হন না। পোপকে তাঁর মন্ত্রশিষ্য বলা যায়, যদিও আত্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন, নীতিবাক্যকথন ইত্যাদিতে জুভেন্যালের চেয়ে হোরেসের প্রভাব অধিকতর স্পষ্ট। পোপের প্রকাশভঙ্গি অতীব বলিষ্ঠ, কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষের নির্লজ্জ প্রকাশ তাঁর রচনাকে কিয়দংশে দুর্বল করে দিয়েছে। ড্রাইডেন যেখানে প্রতিপক্ষের নিন্দাবাদ করেছেন সেখানেও তার সদ্‌গুণের কথা বিস্মৃত হন নি, যেমন 'অ্যাবস্যালম অ্যাণ্ড অ্যাকিটোফেল'এ অ্যাকিটোফেলের অর্থাৎ আর্ল অব শ্যাফ্‌ট্‌স্‌-বেরির চারিত্রিক ত্রুটি উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে বিচারকার্যে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করেছেন: We abhor the statesman but praise the judge. ড্রাইডেনের আরও দুটি মহৎ গুণ ছিল— তীক্ষ্ণ হিউমারবোধ[১৫] ও চরিত্রাঙ্কনপটুতা। তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্র একাধারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়বিশেষের মুখপাত্র। শুধু ব্যক্তিত্বের উপর জোর দিলে চরিত্রাঙ্কন বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, আবার কেবল শ্রেণীগত ভ্রমপ্রমাদের তালিকা প্রণয়ন করলে প্রাণবন্ত চরিত্রসৃষ্টি

১৫। উপরে 'ম্যাক ফ্লেকনো' সম্পর্কিত মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

সম্ভবপর হয় না। ড্রাইডেন সেইজন্যে মধ্যপথাবলম্বী হয়ে একটিকে অপরের পরিপূরকরূপে প্রয়োগ করেছেন এবং নিতান্ত সাময়িক বিষয়কেও স্থায়িত্ব দান করতে পেরেছেন।

বাঙলা ব্যঙ্গকাব্যের উৎপত্তি বাঙালীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তায়।[১৬] প্রাচীন কাব্যের—এমন কি ধর্মবিষয়ক রচনার—কোনো কোনো অংশে বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ভারতচন্দ্র রায় বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গকে তাঁর কাব্যরচনার অন্যতম প্রকরণ রূপে গ্রহণ করেন। মানব-মানবীর মতো দেবদেবীও তাঁর উপহাসের পাত্র—যেমন 'অন্নদামঙ্গলে' ব্যাসদেব এবং স্বয়ং শিবও—যিনি জরতীরূপিণী অন্নপূর্ণার 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ'। ব্যঙ্গকবিতাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর রচনা ঐকান্তিকভাবে বস্তুনির্ভর। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর রক্ষণশীল মনোবৃত্তি এবং নবাগত পাশ্চাত্ত্য ভাবের (অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'কু'ভাবের) মধ্যে যে সংঘাত বাধে তারই উপর তিনি তির্যক দৃষ্টিপাত করেন। নিম্নোদ্ধৃত যুগ্মক এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত :

পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র দেয় কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে।

বাঙালীর মেরুদণ্ডহীনতা এইভাবে আক্রান্ত হয়েছে :

তুমি[১৭] মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।

গুপ্তকবিপ্রবর্তিত ব্যঙ্গকাব্যধারায় প্লাবন আনয়ন করেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ। 'ভারত উদ্ধারে' দেখি ইন্দ্রনাথ শখের দেশহিতৈষণার প্রতি খড়গহস্ত। কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এবং লেখকের কৃতিত্ব এই যে তিনি এই গুরুগম্ভীর ছন্দের মধ্যে কথ্য ভাষা প্রয়োগ করে একে লঘুভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলেছেন। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উপরও তাঁর

১৬। তুলনীয় : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা'।
১৭। অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

—এবং পরবর্তী যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও ব্যঙ্গকবিতার আকর্ষণ রোধ করতে পারেন নি। উৎকট হিঁদুয়ানি তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল, এবং 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত 'দামু ও চামু' কবিতাটিতে তিনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি।[১৮] 'বঙ্গবীর', 'ধর্মপ্রচার' ('মানসী'), 'হিং টিং ছট' ('সোনার তরী') ইত্যাদির মূল ভাবও ঐ ধর্মান্ধতা, তবে এখানে তিনি স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ হারান নি। শেষোক্ত রচনাটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবিতা। বক্র দৃষ্টিভঙ্গির পরাকাষ্ঠা দেখা যায় 'হিং টিং ছটে'র গৌড়ীয় ভাষ্যে :

কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'হিং টিং ছট'।

সাম্প্রতিক কালে সজনীকান্ত দাস, বনফুল, অ. কৃ. ব. প্রভৃতি লেখক ব্যঙ্গকাব্যের পরিধি আরও বিস্তৃত করেছেন। মার্কসবাদী কবিতাও অনেক সময়ে বিদ্রূপাত্মক :

হা-ঘরে আমরা। মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে, পৃথিবী মায়া কেবল—
তাই তো আজকে মন্ত্র নিয়েছি উপবাসীর।
ফলে নেই লোভ! তোমার গোলায় তুলি ফসল।
(সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'প্রস্তাব')

মক হিরোয়িক (Mock-heroic) ও বার্লেস্ক (Burlesque)

সাধারণ ব্যঙ্গকবিতা (আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি) ছাড়া আরও দুটি বিশিষ্ট রূপ অনুধাবনযোগ্য—'মক হিরোয়িক' ও 'বার্লেস্ক'। মক-হিরোয়িক মহাকাব্য অথবা বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যের বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ। এখানে অতিশয় তুচ্ছ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয় মহাকাব্যরীতি অনুসারে, অর্থাৎ ব্যাপারটা হয়ে পড়ে মশা মারতে কামান দাগার

১৮। চন্দ্রনাথ বসু ও যোগীন্দ্রনাথ বসু এখানে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

মতো। হেলেন হরণ 'ইলিয়ড'এর বিষয়বস্তু, আর পোপের 'রেপ অব দ্য লক'এর বর্ণনীয় বিষয় একটি অভিজাত মহিলার কেশগুচ্ছ কর্তন। অন্যান্য উদাহরণ ড্রাইডেনের 'ম্যাক ফ্লেকনো', ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার' ইত্যাদি।[১৯]

বার্লেস্কও অনুকৃতিমূলক ও হাস্যোদ্দীপক। এর উপাদান তিন প্রকার: প্যারডি (parody), ক্যারিকেচার (caricature). ও ট্র্যাভেস্টি (travesty)। প্যারডির অর্থ কোনো বিশেষ কবি বা বা কবিগোষ্ঠীর ভাষা ও ছন্দোরীতির অবিকল ব্যঙ্গানুকৃতি, যেমন শ্রীমান দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানদীর 'নটেন্দ্রলীলা কাব্যে'র সূচনাতে মধুসূদনের রচনাশৈলী অনুকৃত হয়েছে :

সম্মুখ-সমরে জিনি মাইকেলী ছন্দে
আহা কি নবীন ছন্দ ভাতিল ভারতে···
কহ দেব নটমণি, মকরন্দ-রবি···
রচিলে যে নব গাথা রুচিকে মোহিয়া
অকালে এ বঙ্গভূমে, শেক্ষপীরে নিন্দি।[২০]

ক্যারিকেচার বলতে বোঝায় অতিরঞ্জিত, কৌতুকাবহ চরিত্র চিত্রণ। এর চমৎকার দৃষ্টান্ত ড্রাইডেনের শ্যাডওএল ('ম্যাক ফ্লেকনো') 'অ্যাবস্যালম ও অ্যাকিটোফেল'এর জিমরি অর্থাৎ ডিউক অব বাকিংহ্যাম। ট্র্যাভেস্টির সার মর্ম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হাস্যকর অতিরঞ্জন অথবা ভাব ও ভাষার মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি।

মক-হিরোয়িক ও বার্লেস্কের পার্থক্য সব সময়ে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না। মক-হিরোয়িককে স্বচ্ছন্দে বার্লেস্ক বলা যেতে পারে কিন্তু সব বার্লেস্ক মক-হিরোয়িক নয়। মহাকাব্য বা বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যরীতির অপপ্রয়োগ মক-হিরোয়িকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু বার্লেস্কে যে

১৯। জগবন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য' কবিত্বগুণে অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নইলে একেও 'মক-হিরোয়িক' আখ্যা দেওয়া চলত।

২০। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত। কটাক্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতি।

কোনো রীতি গৃহীত হতে পারে। কোনো জীবনাদর্শ কিংবা রচনাশৈলীতে যখন অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয় তখন এই শ্রেণীর কবিতারচনার দিকে লেখকদের ঝোঁক পড়ে। মধ্যযুগীয় শিভ্যালরির যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত হল তখনই চসার তার আদ্যশ্রাদ্ধ করলেন 'সার টোপাস'এ। সমগুণবিশিষ্ট আর একটি রচনা বায়রনের বিখ্যাত 'ডন জুয়ান,' যা একধারে বার্লেস্ক ও সৃজনধর্মী কাব্যগ্রন্থ।[২১]

আবোল-তাবোল (Nonsense)

ইংরেজীতে যাকে ননসেন্স কবিতা বলা হয় সুকুমার রায়ের ভাষায় আমরা তাকে আবোল-তাবোল বলতে পারি। কথাটির আভিধানিক অর্থ 'অসম্বদ্ধ কথা, প্রলাপ', আর ননসেন্স বলতে বুঝি সেন্স অর্থাৎ বুদ্ধি বা যৌক্তিকতার অভাব। বস্তুত এইজাতীয় কবিতার লক্ষণ হচ্ছে ভাবের অসম্বদ্ধতা এবং যুক্তিবাদের প্রতি পরম অশ্রদ্ধা। অন্য ধরনের কবিতা দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু সেই কারণে তা ননসেন্স-নামধেয় নয়। আবার আবোল-তাবোল যদি রূপক বা ব্যঙ্গাত্মক হয় তা হলে তা জাতিভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' মহৎ সৃষ্টি, কিন্তু এর সব কবিতা—যেমন বিদ্রূপপূর্ণ 'সৎ পাত্র', 'ট্যাঁস গরু' ইত্যাদি—ঐ পর্যায়ে পড়ে না। একটি ইংরেজী কবিতায় বলা হচ্ছে : শহরে একদল ভিখিরী আসছে, তাদের একজনের পরনে আছে ভেলভেট গাউন, আর সকলের পোশাক শতছিন্ন। এটিও ননসেন্স কবিতা নয় এই কারণে যে ঐ গাউনপরা লোকটি সম্ভবত কোনো স্কচ, ওএলস অথবা ওলন্দাজ রাজা এবং এঁকে হাস্যাস্পদ করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

ননসেন্সপ্রণেতা চালিত হন তার খেয়ালী মেজাজের দ্বারা—ধীশক্তির দ্বারা নয়। তাঁর সৃষ্ট জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম বিপর্যস্ত। এখানে ফুল ফোটে 'ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম্' শব্দ তুলে, 'শাঁই শাঁই পন্

২১। এইরূপ সৃজনধর্মী ব্যঙ্গরচনায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্পেনীয় লেখক সারভাঁতের 'ডন কুইক্সট'।

পন্ ক'রে ফুলের গন্ধ ছুটে যায়, কলকাতা শহর মানুষের মতো চলমান হয়ে ওঠে :

হাওড়ার ব্রিজ্ চলে মস্ত সে বিছে,
হারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে।

এখানকার অধিবাসীরাও এক অদ্ভুত প্রকৃতির জীব। কেউ আকাশের গন্ধ নিয়ে গবেষণা করে, কেউ কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে, আবার কেউ বা পদক্ষতের জ্বালায় স্লিপারে মাথা গলিয়ে বসে থাকে।

খাঁটি আবোল-তাবোল কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নয়। হাস্য অথবা অদ্ভুত রস অনেকেরই অধিকৃত, কিন্তু অতর্কিতে তাঁদের রচনাতে অর্থের ছায়াপাত হয় এবং তখনই তাঁরা ননসেন্স রাজ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। রূপক কিংবা ব্যঙ্গপ্রবণতা যে ননসেন্স সৃষ্টির প্রতিকূল তার আভাস উপরেই দিয়েছি। নৈতিক মনোভাব সম্পর্কেও এ কথা খাটে। শিশুসাহিত্য প্রায়ই নীতিপন্থী, কিন্তু আবোল-তাবোল রচনা 'অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয়' ঘোষণা করতে পারে না, কারণ ধর্মাধর্মের প্রশ্ন তুললেই ননসেন্স সেন্সের কোঠায় গিয়ে পড়বে।

ননসেন্স কবিতার বিশুদ্ধতা রক্ষণে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছেন এডওআর্ড লিয়র ও সুকুমার রায় (ব্যঙ্গকবিতা কয়েকটি বাদ দিয়ে বলছি)। লিয়রের রচনায় বুদ্ধির দীপ্তি বা আড়ম্বর নেই, আছে বর্ণবৈচিত্র্য ও চিত্তচাঞ্চল্যকর ধ্বনিস্পন্দন :

Far and few, far and few
Are the lands where the Jumblies live.

বুদ্ধদেব বসুর মতে কবিত্বগুণে সুকুমার রায় লিয়রের চেয়েও মহত্তর। কিন্তু তাঁর কবিত্ব খেয়ালী কল্পনাশ্রিত বলে মাঝে মাঝে একটু সন্দেহ জাগে। তিনি সুরসৃষ্টি করেন 'মেঘ মুলুকে ঝাপসারাতে' এবং 'আলোয় ঢাকা অন্ধকারে'র 'গন্ধে' ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পান। সুরভিত অন্ধকার ননসেন্স জগতে অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু এইরূপ কল্পনাবিলাস স্থায়ী কাব্যসত্য প্রকাশের উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্নটি সাধারণভাবে আবোল-তাবোল কবিতার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে উত্থাপন করা যায়।

'এ ডিফেন্স অব ননসেন্স' নামক প্রবন্ধে চেস্টারটন বিষয়টির দার্শনিক বিচার করেছেন। লিয়রের কবিতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : সহজ ও যুক্তিসম্মত বিবরণের মাঝখানে খাপছাড়া প্রাদেশিক কথা এমনি আকস্মিকভাবে এসে হাজির হয় যে আমরা যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে মেনে নিতে বাধ্য হই :

দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।

এই অর্থবোধের মানে কিন্তু এই নয় যে যুক্তিবাদের কাছে নতিস্বীকার করা হল। মনুষ্যজগতে—এবং বিশেষ করে লিয়র প্রমুখ কবিদের নিকট—বিচারবুদ্ধি সব সময়েই একটা পরিহাসের ব্যাপার। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আবোল-তাবোলের অর্থ সাধারণ বুদ্ধি-গম্য অর্থ নয়। চেস্টারটনের মতে এখানে আমরা আধ্যাত্মিকতার সংকেত পাই। আদিম মানবের চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীর সব কিছু দেখতে শিখি, এবং তখন পাখি আর দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণী নয়, তাকে মনে হয় একটি বৃন্তচ্যুত ফুল। ইটপাথরের বাড়ি যেন একটা দৈত্যাকার শিরস্ত্রাণ ও আতপত্র। আধ্যাত্মিকতা এবং ননসেন্স দুয়েরই উৎপত্তি একই বিস্ময়বোধ থেকে। '(হে ঈশ্বর) জনহীন মরুভূমিতে তুমি কি বৃষ্টি পাঠিয়েছ'—এই উক্তিতে ঐশ্বরিক বিধানের বিরাট যুক্তিহীনতায় যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে সেই যুক্তিহীনতা ও বিস্ময়বিমূঢ়তা অন্য রূপে ব্যক্ত হয়েছে লিয়র, সুকুমার রায় প্রভৃতির কবিতাতে। ননসেন্স-রচয়িতা তাঁর নিজস্ব জীবনবেদ অনুসারে একটি স্বতন্ত্র, অর্থহীন (nonsensical) জগৎ নির্মাণ করেন—যা গভীরতর অর্থে ট্র্যাজিক, রোমান্টিক কিংবা আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে তুলনীয়।

ছড়া (Nursery Rhymes)

আবোল-তাবোল কবিতার সঙ্গে ছড়ার অনেক মিল রয়েছে, যথা ভাবের অসম্বদ্ধতা, ঘটনার পারম্পর্যহীনতা ইত্যাদি। তফাত এই যে ছড়া পুরোপুরি লোকসংগীত অথবা কবিতা যা ননসেন্স কবিতা

নয়। তা ছাড়া ছড়ার—অন্তত বাঙলা ছড়ার—ভাষার বাঁধুনি অত্যন্ত আলগা এবং ভাষা ও ছন্দ অসংস্কৃত এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্যতাদুষ্ট। অপর পক্ষে, কলানৈপুণ্যের দিক দিয়ে ননসেন্স কবিতা অনিন্দনীয়। অবশ্য এই সব শ্রেণীর রচনা যখন শিশুচিত্তে ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার করে তখন ছড়ার সঙ্গে এর বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। এই হিসাবে সুকুমার রায়ের কোনো কোনো কবিতাকে ছড়া বলা যেতে পারে।

ছড়া লোকপরম্পরাগত কাব্যোক্তি এবং এর রচনাকাল ও রচয়িতার নাম সম্পূর্ণ অবিদিত। ছড়ার সত্যকার রসগ্রাহী শিশুচিত্ত। কিন্তু শৈশবস্মৃতির সঙ্গে ছড়া এত গভীরভাবে জড়িত থাকে যে মন এর প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। শিশুর মনোহরণই অবশ্য এই সব পদ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেইজন্য দেখা যায় অনেক ছড়ার সূত্রপাত হয়েছে খেলাধূলা থেকে, যেমন 'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই', 'শিল শিলাটন শিলের বাটন', 'আঁটুল বাঁটুল শামলা শাঁটুল', 'আগডুম বাগডুম ঘোড়ার ডুম সাজে', 'দোল দোল দুলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি', 'থ্য লিটল পিগ ওএন্ট টু মার্কেট', 'টু লিটল বার্ডস সিটিং অন এ ওঅল' ও 'হ্যাণ্ডি ড্যাণ্ডি'। ছড়ার সাহায্যে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। ইংরেজী 'এ ইজ অ্যান আর্চার' এই ধরনের পদ। 'হাসিখুশি'র 'অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে' ইত্যাদি এই ছড়ারীতিরই অনুকরণ। কতকগুলি ছড়া আবার ঘুমপাড়ানি গান, যেমন 'ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুমের বাড়ি যেয়ো', 'আয় ঘুম যায় ঘুম', 'খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো' প্রভৃতি।

সহজ অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির অনাড়ম্বর প্রকাশ ছড়াগুলিকে বিস্ময়কর রসঘনত্ব দান করেছে। অনেক ছড়া আনন্দোচ্ছল নদীপ্রবাহের মতো :

উলু উলু মাদারের ফুল
বর আসছে কত দূর।

কতকগুলিতে আবার বেদনার্ত হাহাকার শোনা যায় :

হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি,
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

বিদ্রূপের নিদর্শনও দুষ্প্রাপ্য নয় :

চোখ খাও গো বাপ-মা, চোখ খাও গো খুড়ো,
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো বুড়ো।

ছড়াগুলিতে গ্রাম্য প্রকৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রকৃতিবর্ণনা বস্তুতান্ত্রিক অথচ শ্রীমণ্ডিত। নিম, নিসিন্দা, নটেশাক ইত্যাদির দিকে কবির যেমন লক্ষ্য আছে, তেমনি আবার নদীমাতৃক বাঙলাদেশের সৌন্দর্যদর্শনে তিনি মুগ্ধচিত্ত :

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
....
এ নদীর জলটুকু টলমল করে
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে।
....
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।

ছত্র কয়েকটির চিত্রধর্মিতা দর্শনীয়। গ্রামের পথে ঘাটে মাঠে এবং নদী ও পুকুরে যে সব স্থলচর, জলচর ও নভশ্চর প্রাণী সচরাচর চোখে পড়ে তারা অবলীলাক্রমে ছড়াগুলির মধ্যে এসে স্থান সংগ্রহ করে নিয়েছে। এই পল্লীপ্রকৃতির পটভূমিতে দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনের ছবিও অঙ্কিত হয়েছে। ছবিটিতে শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট রেখার টান দেখতে পাওয়া যায় এবং আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কতকগুলি স্বপ্নদৃশ্য—আসন্ন বিবাহউৎসব, শ্বশুরালয়ে জামাতৃ-আগমন, কন্যার পতিগৃহে যাত্রা, খোকাবাবুর মৎস্যশিকার অথবা ভ্রমণ ইত্যাদি। কন্যাবিদায়ের চিত্র অপেক্ষাকৃত বর্ণোজ্জ্বল।

যাঁরা ছড়া লিখেছেন তাঁরা সবাই অজ্ঞাতনামা নন। কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী ছড়ার রচয়িতা বেন জনসন, ডক্টর জনসন, সারা ক্যাথারিন মার্টিন, জেন টেলর ও সারা যোসেফা হেল। ইদানীং বাঙলায় যাঁরা ছড়া রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত

অন্নদাশঙ্কর রায়। রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া', 'খাপছাড়া' প্রভৃতি গ্রন্থও স্মরণীয়।

গদ্যকবিতা

গদ্যকবিতা কিংবা সমধর্মী ছন্দোবন্ধ রচনার প্রতিপত্তি আজকাল সব চেয়ে বেশী। এর রীতিগত বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ চিরাচরিত ছন্দোরীতি-বা মিটারের অব্যবহার—অত্যন্ত চমকপ্রদ, এবং রীতি ও ভাবের প্রভাব যখন পারস্পরিক তখন ভাবস্বাতন্ত্র্যও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গৃহীত হতে পারে। এই স্বাতন্ত্র্য বলতে অনেক বোঝেন আধুনিকত্তা, এবং তাঁদের বক্তব্য এই যে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীতে এমন একটা অভিনবত্ব আছে যা কোনো প্রকার পুরাতন রচনাপদ্ধতি অনুসারে যথাযথভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। যুগের প্রয়োজনেই গদ্যকবিতার জন্ম, এবং এই সর্বকনিষ্ঠ কাব্যরূপই[২২] যুগধর্ম প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

সাধারণ পদ্যছন্দ একটা বিশেষ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক চরণের মাত্রা ও ধ্বনিবিন্যাস, পর্ববিভাগ, ছেদ, যতি ও মিলের প্রয়োগ এবং স্তবকগঠন নির্ধারিত হয়। মিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয় যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দে[২৩]—পর্ব, ছেদ, যতি ইত্যাদির প্রয়োগও সর্বত্র কঠোর নিয়মবদ্ধ নয়—তবুও মোটের উপর কবি ছন্দের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।[২৪] গদ্যকবি এই ছন্দোবন্ধন অস্বীকার করেন। কিন্তু এতে তাঁর লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি পায় কিনা সেটা চিন্তনীয় ব্যাপার। পদ্যছন্দের মিল যেমন বন্ধনস্বরূপ

২২। ইংরেজী গদ্যকবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায় বাইবেলে। রবীন্দ্রনাথ যজুর্বেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে গদ্যছন্দের প্রাচীনত্বের কথা বলেছেন।

২৩। অন্যপ্রকার ছন্দও মিলবর্জিত হতে পারে। কলিন্সের 'ওড টু ইভনিং', রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্ফল কামনা' ('মানসী') দ্রষ্টব্য।

২৪। শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েও কবি কি ভাবে মুক্তির আস্বাদ পান আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তার আলোচনা করেছি।

তেমনি আবার কবির সিদ্ধিপথের দিগ্‌দর্শী। নির্দিষ্ট ধ্বনিসংখ্যা তাঁর লয়সৃষ্টির সহায়ক, কিন্তু গদ্যকবিতায় মিলের প্রয়োগ যখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তখন লয় সৃষ্টির জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয় প্রধানত ছন্দস্পন্দের (rhythm) উপর।[২৫] ছন্দস্পন্দ গদ্য অগদ্য সর্বপ্রকার কবিতারই প্রাণ, এবং বিশেষ করে এরই সাহায্যে গদ্যছন্দ মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। গদ্যকবিতায় ভাবের আধিপত্য অপ্রতিহত,—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়, এবং পংক্তির মাত্রাবাহুল্যে ও ভাবানুগ ধ্বনিবিন্যাস দেখে মাঝে মাঝে এ রকম সন্দেহও জাগে, কবি যেন নিঃশেষে তাঁর হৃদয়াবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, ভাব যেখানে উদ্বেল কবি সেখানে তাকে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য দেন কিন্তু আবার সেই সঙ্গে ধ্বনিবিন্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও করেন। ঐ বিন্যাস পদ্যছন্দে যতটা সুনিয়মিত এখানে ঠিক ততটা না হলেও বিশৃঙ্খল নয়। নমুনা হিসাবে জীবনানন্দ দাশের 'হাওয়ার রাত' থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি :

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো—আকাশে এক তিল
ফাঁক ছিলো না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়োয় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা।

এখানে হৃদয়ানুভূতি অদ্ভুত রকম গতিশীল। কিন্তু ছন্দস্পন্দের নিপুণ প্রয়োগের জন্য ভাবের স্বৈরাচার ঘটে নি। নিঃসন্দেহে কবির প্রকৃতিদত্ত ছন্দোবোধ—যা গদ্যকবির প্রধান সহায়—রচনাটিকে কাব্যোচিত সংহতি দান করেছে। এ কথা আমাদের সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে গদ্যকবিতা আসলে কবিতা, গদ্য নয়। ভাবরস-প্রধান উচ্চশ্রেণীর গদ্যরচনাতেও ছন্দস্পন্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেখানে কোনো বিশেষ ছন্দোরূপ দেখা যায় না।

২৫। পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইংরেজী গদ্যকবিতার জনক অ্যামেরিক্যান কবি ওয়ালটার হুইটম্যান। ইংলণ্ডে এর গোড়াপত্তন হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে—প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে, এবং বর্তমানে এই রীতিই সর্ববাদিসম্মত ও সুপ্রচলিত। বাঙলা গদ্যকবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'তে। বইটির অন্তর্গত যে কোনো রচনাকে গদ্যকবিতার রূপ দেওয়া যেতে পারে, কোনো রকম অঙ্গহানি না করে; যেমন 'পায়ে চলার পথে'র প্রথম দু-তিনটি লাইন এই ভাবে লিপিবদ্ধ হতে পারে:

এই তো পায়ে চলার পথ,
এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে,
মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে,
খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়।

পরে তিনি গদ্যছন্দের ব্যাপক প্রয়োগ করেন 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। সাম্প্রতিক কাব্য প্রধানত গদ্যরীতির অনুগামী, পদ্যছন্দ এখনও পরিত্যক্ত হয় নি, কিন্তু গদ্যকবিতার ভঙ্গি—এবং কাঠামোও—ছন্দোবদ্ধ কবিতাতে অবলম্বিত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

গুরুর দর্শন, কর্তার বাক্য, দলীয় ভক্তির অদ্ভুত দৈবে
মর্‌লে যাও স্বর্গে—জীবনকে বানাও নরক—বিশুদ্ধ আর্যামি সইবে
বিদেশীর শাসন।...

(অমিয় চক্রবর্তী: 'চেতন স্যাকরা')।

অলংকার

কবিতার প্রকরণ মুখ্যত চার রকম : অলংকার, রূপকল্পনা (imagery), ছন্দ ও ছন্দস্পন্দ (rhythm)। পূর্ববর্তী কোনো না কোনো অধ্যায়ে এই-সব প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপিত হয়েছে, সুতরাং এখানে যে কিছুটা পুনরুক্তিদোষ ঘটবে সেটা গোড়াতেই বলে রাখা ভালো। অলংকার-বিষয়ক আলোচনাতে[1] আমরা সংস্কৃত সাহিত্যবিচারকদের অতিরিক্ত অলংকারপ্রবণতার নিন্দা করেছি এবং কাব্যের অলংকরণ যে অত্যাবশ্যক নয় একাধিক দৃষ্টান্তসহ তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি। এরূপ মন্তব্য প্রকাশের অর্থ অবশ্য এই নয় যে কাব্যজগতে অলংকার অপাঙ্‌ক্তেয় বা অবজ্ঞেয়। তবে কবিতায় এর অন্তর্ভুক্তি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে—বহিরঙ্গ রূপে নয়। এই সহজ সত্যটি মনে রেখে অলংকারবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

অলংকারতত্ত্বের (rhetoric) প্রথম উদ্ভাবক প্রাচীন গ্রীক মনীষীরা। একই সময়ে তাঁরা কাব্যতত্ত্বেরও উদ্ভাবন করেছিলেন, এবং একটি যাতে অপরের সঙ্গে মিশে না যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। রেটরিকের বিচার্য বিষয় ছিল বাগ্মিতা ও গদ্যরচনার গুণাগুণ এবং পোয়েটিক্স-এর—ট্র্যাজেডি, মহাকাব্য ইত্যাদির প্রকৃতি ও রচনাশৈলী। ভারতীয় নন্দনশাস্ত্রে দেখা যায় অলংকারতত্ত্ব যেন কাব্যতত্ত্বকে গ্রাস করার চেষ্টা করেছে। অলংকার এখানে কাব্য-বিচারের মূলসূত্র রূপে গৃহীত হয়েছে, এবং এর যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে স্থানে স্থানে হাস্যকর ভ্রান্তিবিলাস ঘটেছে। যে বাক্য এমনিতে নিরাভরণ আলংকারিকদের চাতুর্যগুণে সেখানেও অলংকার আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন, বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণিবিশেষের 'স্বভাব' অর্থাৎ স্বধর্ম সম্পর্কিত সহজ 'উক্তি' বা বর্ণনাতে নিশ্চয় কোনো অলংকারের নামগন্ধ নেই, কিন্তু যেহেতু সহজকে সহজভাবে গ্রহণ করা তাঁদের প্রকৃতি-

১। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিরুদ্ধ সেইজন্য এখানেও তাঁরা একটা অলংকার খুঁজে বার করেছেন, এবং তার নাম দিয়েছেন 'স্বভাবোক্তি'। তাঁদের মতানুসারে স্বভাবোক্তির দুটি নমুনা দিতে পারি। একটি রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা :

ডাকছে মেঘ, বৃষ্টি ঘন পড়ছে ধরাতলে,
ভেক সকলে কুতূহলে খেলছে ধারার জলে।
ময়ূর শাখে কেকা ডাকে, ছড়িয়ে সুনীল পাখা,
হরিৎ, পীত, নীল, লোহিত রঙ্ শরীরে মাখা। ('বর্ষা')

অপরটির রচয়িতা কালিদাস রায় :

রাঙচিতা-বেড়া দিয়ে ঘেরা
মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটীর অঙ্গনে বালকেরা
করিতেছে ছুটোছুটি।.........
ডাহিনে বিলের জলে ফুটে আছে কুমুদ-কমল,
বাঁয়ে বেণুকুঞ্জগুলি বায়ুভরে করে টলমল।
('বিদ্যালয়পথে')

দুটিতেই নিসর্গবর্ণনা আছে, কিন্তু সেই কারণেই কি এদের সাজাত্য স্বতঃসিদ্ধ? প্রথমটির বর্ণনাভঙ্গি এতই বিশেষত্বহীন যে বর্ণিত বিষয়েব মহিমা এখানে অপ্রকাশ। দ্বিতীয়টির পল্লীদৃশ্য বাস্তবানুগ ও মনোরম হলেও প্রকৃতপক্ষে যা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে তা দৃশ্যাতিবিক্ত একটা হৃদয়াবেগের ব্যঞ্জনা, যা পুষ্ট হয়েছে কবির মধুর বাল্যস্মৃতিব দ্বারা। পদ্যাংশ দুটির এই ভাবগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট, কিন্তু স্বভাবোক্তির রঙিন চশমা পরলে কি ঐ পার্থক্য সহজে চোখে পড়বে? অবশ্য যে কোনো অলংকার বিভিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু এখানে আপত্তির কারণ এই যে স্বভাবোক্তিব সংজ্ঞা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে কোনো সংগতি নেই। স্বভাবোক্তি অনেকটা বস্তুগত বর্ণনা, তবুও সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে এই রকম বর্ণনাত্মক কবিতাও সময়ে সময়ে রচয়িতার হৃদয়াবেগে কম্পমান। 'চিত্রা'র অন্তর্গত 'সুখ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরের যে ছবি[২] এঁকেছেন তাকে ছবি

২। কবিতাটির কয়েকটি চরণ প্রায়ই স্বভাবোক্তির নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়।

না বলে তাঁর মানসচিত্রের পশ্চাৎপট বললে কবিতাটির সত্য পরিচয় দেওয়া হবে। তাঁর 'প্রাণে' যে 'শান্তিধারা' বইছে প্রত্যেকটি দৃশ্য এখানে তারই দ্বারা অভিনিষিক্ত।

উপমা

সব অলংকারই অবশ্য ভ্রান্তিজনক নয়, এবং কোনো কোনো অলংকার, যেমন উপমা, কাব্যের সৌন্দর্য ও অর্থঘনত্ব বৃদ্ধি করে। সমস্ত অলংকারের মধ্যে উপমার[৩] আধিপত্য সবচেয়ে বেশী, এবং অ্যারিস্টটল, রোমক আলংকারিক কুইনতিলিয়ন, 'কাব্যালংকারসূত্র-বৃত্তি'র রচয়িতা বামন, এবং আরও অনেকে উপমাকেই প্রধান অলংকাররূপে গ্রহণ করেছেন। অ্যারিস্টটল এর সংজ্ঞা দিয়েছেন—প্রতীয়মান বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্যকল্পনা,[৪] এবং তাঁর মতে প্রতিভা ছাড়া এই সাদৃশ্যকল্পনা সম্ভব হয় না। শিল্পক্রিয়ার সার্থকতা যেমন বিসদৃশ উপাদানসমূহের সমন্বয় সাধনে, উপমাপ্রয়োগের সাফল্যও তেমনি বৈধর্ম্যমূলক দুটি বস্তুর উপর একত্ব আরোপে। সুতরাং উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রকে কবির স্ব-ক্ষেত্র বললে অতিশয়োক্তি হবে না। এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক ভাষা—যা কবির ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম—অল্পবিস্তর উপমাত্মক।[৫] সাধারণ কথাবার্তাতেও আমরা অজ্ঞাতসারে অজস্র উপমা ব্যবহার করি এবং সময়ে সময়ে গ্রাম্যতাদোষ ঘটলেও ঔচিত্য বা ঔজ্জ্বল্যের কখনো অভাব হয় না। কাব্যের অন্তর্গত উপমার প্রকৃতি অবশ্য অন্য রকম,

৩। ইংরেজী 'simile' ও 'metaphor'এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'উপমা' ও 'রূপক'। আমরা এখানে 'উপমা' শব্দটি 'সিমিলি' ও 'মেটাফর' অর্থে এবং 'রূপক' শব্দটি 'allegory' (যা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) অর্থে প্রয়োগ করেছি।

৪। তুলনীয়: সাম্যং বাচ্যম্ অবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ—'সাহিত্যদর্পণ'

৫। তুলনীয়: 'Language is highly metaphorical.'—Shelley.

তবে এতে যে ভাষার স্বধর্ম ও ঐতিহ্য রক্ষিত হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একেবারে উপমাহীন কবিতা প্রায় অচিন্তনীয়। 'কাঁটা হেরি' ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে' ইত্যাদি ছন্দোবদ্ধ নীতিবাক্য স্থূলভাবে যতটা উপমাবহুল, আবেগচঞ্চল,রসোত্তীর্ণ কবিতাও সূক্ষ্মভাবে ঠিক ততটা :

আনন্দের ঝটিকায় কাঁপে প্রাণ স্পন্দমান তারকার মতো ;
বিরাটের তীরে-তীরে জীবন কল্লোলি ওঠে—
নমো নমো নমো।

(প্রেমেন্দ্র মিত্র—'নমো নমো'।)

উপমা প্রয়োগের প্রধান বৃত্তি বর্ণনীয় বিষয় অথবা কোনো বিমূর্ত ভাবকে ইন্দ্রিয়বেদ্য রূপ দান করা, বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা ও রচনাটিকে চিত্রধর্মী করে তোলা। মধুর মধ্যরাত্রিকে কিটস বলেছেন—'the honey'd middle of the night' ('ইভ অব সেণ্ট অ্যাগনিস')। এখানে 'সুইট' কিংবা ছন্দ বজায় রেখে অন্য কোনো বিশেষণ ব্যবহার করা যেত, কিন্তু 'হানিড' যেমন রাত্রির রূপকে প্রত্যক্ষগোচর করে দিচ্ছে কোনো গুণবাচক বিশেষণ তা পারত না। রবীন্দ্রনাথের 'কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে'র 'মধু' কথাটি সমার্থ মনে হতে পারে কিন্তু শব্দটি বসন্ত অর্থেও প্রযুক্ত হয় বলে এর আবেদন অত বেশী নয়। একটি শব্দের অপ্রত্যাশিত প্রয়োগ অর্থের ব্যঞ্জনা কতখানি বাড়িয়ে দিতে পারে কিটসের বাক্যাংশটি তার একটি চমৎকার প্রমাণ।

ভাব বা অনুভূতিকে মূর্ত করে তোলারও অন্যতম রীতি উপমা প্রয়োগ। হোমারীয় উপমার লক্ষণ আমরা আগেই[৬] বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। এর তুলনায় মহাকাব্যেতর রচনার অন্তর্গত উপমা প্রত্যক্ষত সংকুচিত, কিন্তু ভাবগাম্ভীর্য অথবা শিল্পসৌকুমার্যের দিক দিয়ে মোটেই নিকৃষ্ট নয়। কোনো কোনো স্থলে অবশ্য উপমা হাস্যরসাশ্রিত

৬। তৃতীয় অধ্যায় : মহাকাব্য দ্রষ্টব্য।

হতে পারে, যেমন রবীন্দ্রনাথ কর্কশ ভাষণের বর্ণনায় এইরূপ অলংকার ব্যবহার করেছেন :

কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না ক'রে
পড়ি' গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে,
মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে। ('পুরস্কার')

মৃদু ব্যঙ্গ বা হালকা ভাব প্রকাশের জন্য এইরূপ অলংকার প্রয়োগই বিধেয়। কিন্তু বিদ্রূপাত্মক কবিতাতেও মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের উপমা প্রযুক্ত হয়। এর নিদর্শন মেলে ড্রাইডেনকর্তৃক আর্ল অব শ্যাফ্‌টস্‌বেরির চরিত্রচিত্রণে :

A fiery soul, which, working out its way,
Fretted the pigmy body to decay :
And o'er informed the tenement of clay.
('অ্যাবস্যালম ও অ্যাকিটোফেল')।

ব্যঙ্গকবিতার প্রকৃতি অনুসারে উপমাটি বুদ্ধিদীপ্ত হলেও স্পষ্টত কল্পনাপ্রসূত। অন্যত্র, বিশেষ করে অনুভূতিপ্রধান গীতিকাব্যে, কল্পনার দ্যুতিই অধিকতর প্রকাশমান। চরম রিক্ততাবোধ যখন শেক্সপিয়রের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তখন তিনি বিগতশ্রী শরৎ ও প্রাচীন উপাসনাগারের ধংসাবশেষের মধ্যে স্বকীয় মনোভাবের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন :

That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang.
('সনেট', ৭৩)

শ্লোকটিতে হৃদয়ভাব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু মহাকাব্যে যেমন এখানেও তেমনি উপমান নিজস্ব গৌরবে মহীয়ান।

উপরিউদ্ধৃত শেক্সপিয়রের ছত্র কয়েকটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে উপমা বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করে অনেকটা তির্যক ভাবে। সাধারণ হিসাবে বলা যেতে পারে রূপরসগন্ধস্পর্শ যখন

আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করি তখন সঙ্গে সঙ্গে কবিতার তাৎপর্য সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট প্রতীতি জাগে কিন্তু অনেকক্ষেত্রে আমরা বিপরীত অভিজ্ঞতাও লাভ করি। কোনো কোনো লেখক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের তুলনা করেন অতীন্দ্রিয় সত্তার সঙ্গে, যেমন শেলির 'ওড টু দ্য ওএস্ট উইণ্ড'এ 'ঐন্দ্রজালিকে'র কাছ থেকে পলায়মান প্রেতের সঙ্গে তুলিত হয়েছে ঝটিকাতাড়িত শুষ্কপত্র।[৭] এই জাতীয় উপমা অর্থকে সুস্পষ্ট না করে আরও রহস্যময় করে তোলে। কখনও কখনও আবার একই ভাবপ্রকাশের জন্য একাধিক উপমা ব্যবহৃত হয়, এবং এরও সুনিশ্চিত ফল আর্থিক অনচ্ছতা। হ্যামলেট 'অস্ত্রধারণ' করছে 'দুঃখকষ্টের সমুদ্রে'র বিরুদ্ধে, ডাইল্যান টমাসের একটি ছত্রে মানুষের হাত কল্পিত হয়েছে সন্ধিপত্রস্বাক্ষরকারী এবং ব্যাধি ও মন্বন্তরের জনয়িতৃরূপে, এবং 'উজ্জীবন'-দেবতার আবাহনীতে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় এক নিঃশ্বাসে 'মৃত্যুঞ্জয়', 'মিশরী শব' এবং 'দিগ্বিজয়ী মরু'-বিহারী 'অর্ধপশু' ও 'অর্ধেক মানবে'র কথা উচ্চারণ করেছেন। সুতরাং বক্তব্যের পরিস্ফুটন—অধিকাংশ স্থলে একথার অর্থ দাঁড়ায় কবির জটিল মনোভাবের শিল্পোচিত প্রকাশ, এবং এই অর্থ যে ভ্রান্ত নয় তা আমরা বুঝতে পারব কাব্যশৈলী ও বৈজ্ঞানিক বর্ণনাপদ্ধতির পার্থক্য নিরীক্ষণ করলে। বিজ্ঞানবিৎ বস্তুবিশেষের পর্যালোচনা করেন তাকে সর্বপ্রকার মানবীয় সম্পর্ক থেকে বিযুক্ত করে, এবং তার একমাত্র কাম্য বর্ণনার যাথাতথ্য। কিন্তু কবি রূপায়িত করেন বস্তুসম্ভূত 'অনুভূতি'কে এবং বস্তুটির মধ্যে তাঁর আত্মনিমজ্জন অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ছাড়া ঐ রূপায়ণ সম্ভব হয় না। হার্বাট রীড উপমাকে (metaphor) বলেছেন, 'সম অর্থের দ্রুত উদ্ভাসন'। 'দুটি রূপকল্প কিংবা একটি ভাব ও একটি রূপকল্প পরস্পরের সম্মুখীন হয় অনুরূপ শক্তি নিয়ে। তাদের মধ্যে সংঘাত বাধে এবং এই ঘাতপ্রতিঘাত এতই অর্থপূর্ণ যে একটা

৭। তুলনীয়ঃ 'চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।' (রবীন্দ্রনাথ)।

আকস্মিক আলোকরশ্মিপাতে পাঠক বিস্ময়চকিত হয়ে ওঠেন' ('ইংলিশ প্রোজ স্টাইল')। রীডের এই উক্তিতে উপমার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুনির্ণীত হয়েছে। যথা উপমান ও উপমেয়ের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এবং সংঘর্ষ, এবং পাঠকের মনে ঐ সংঘর্ষজনিত আলোক-সম্পাত। অসম্পৃক্ত পদার্থসমূহের মধ্যেও এই ভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং উপমাস্থিত রূপকল্পের সহিত কবি নিজেকে ও পাঠককে যুক্ত করেন। এইরূপ উপমা ভাবেরই কম্পন অর্থাৎ অলংকার ও অলংকৃত এখানে অদ্বৈতরূপে শোভমান। সাধারণ অর্থবোধক উপমা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে তৃপ্তিদান করে এবং রচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হয়, তবে এর প্রধান দৌর্বল্য স্থিতিশীলতা যার ফলে কবির ভাবছন্দ এতে স্পষ্টভাবে অনুনাদিত হয় না।

তুলনামূলক অলংকার

চিত্রধর্মী উপমার বিশ্লেষণ বর্তমানে স্থগিত রেখে[৮] আমরা এখানে অন্য কয়েকটি তুলনামূলক অলংকারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি, যথা সমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি ও ব্যতিরেক। সমাসোক্তির অর্থ নৈসর্গিক বা অচেতন বস্তুতে চেতনার অধ্যাস এবং এ দিক দিয়ে ইংরেজী 'personification' এর সঙ্গে তুলনীয়।[৯] এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর'পরে,
ছেঁড়া মেঘে পাতি' মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে
('কবির কাব্য')।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয় 'যেন', 'বুঝি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা :

যেন কোন বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে
(জীবনানন্দ দাশ : 'শকুন')।

৮। 'রূপকল্পনা' দ্রষ্টব্য।

৯। সমাসোক্তিতে কখনও কখনও চেতনে অচেতনের প্রকৃতি অধ্যাসিত হয়—যা পার্সনিফিকেশনে নিষিদ্ধ।

আলংকারিক কৌলীন্য বিচারে অতিশয়োক্তিকে উপমার সমকক্ষ বলা যায়।[১০] উপমা (মেটাফর) ও অতিশয়োক্তি এই দুটি অলংকারেই উপমানের মধ্যে উপমেয় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দুয়ের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। সীতা বলছেন তাঁর কাছে রামের 'পা দুখানি' 'আশার সরসে রাজীব।' এটি উপমার (মেটাফরের) নিদর্শন। এখানে উপমানই মুখ্য, কিন্তু উপমেয়ও উল্লিখিত হয়েছে। অতিশয়োক্তিতে উপমেয় অনুক্ত থাকে :

মুকুতা-মণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা[১১] (মধুসূদন)।

আভিধানিক অর্থে যদি অতিশয়োক্তি শব্দটি গ্রহণ করা হয় তা হলে আলোচ্য অলংকার কদর্থিত হবে, কিন্তু ঠিক এই অর্থে ইংরেজী অলংকার 'hyperbole'এর প্রচলন আছে। জীবনসত্য ও কাব্য-সত্য যখন ভিন্ন প্রকার তখন সুতীব্র ভাবাবেগ প্রকাশের জন্য বা অন্য কোনো কারণে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জন অবশ্য করণীয় বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে মোটের উপর কবির শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সুমিতিরক্ষা অর্থাৎ অতিশয়োক্তিকে আতিশয্যে পরিণত না করা। ব্যতিরেক অলংকার উপমান ও উপমেয়ের যে কোনো একটিকে (সাধারণত প্রথমটিকে) খর্ব করে অপরের উৎকর্ষ বর্ণনা করে, যেমন :

চম্পক শোন—কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে।
(গোবিন্দদাস)।

এখানে গৌরাঙ্গের অঙ্গলাবণ্যের (উপমেয়) তুলনায় চাঁপা, শোন ফুল ও স্বর্ণগিরি দ্যুতিহীন।[১২]

১০। দণ্ডী ও আনন্দবর্ধনের মতে অতিশয়োক্তি 'অলংকারোত্তম' ও 'সর্বালংকাররূপ'।

১১। উপমেয় 'অশ্রু' এখানে অনুল্লিখিত।

১২। সময়ে সময়ে ব্যক্তিবাচক শব্দের পরিবর্তে গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শব্দালঙ্কার

উপমাশ্রিত অলংকারগুলি ছাড়া অন্য যে সব অলংকারের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুপ্রাস, বক্রোক্তি, শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতি। সন্নিহিত শব্দসমূহের ধ্বনিসাম্যকে বলা হয় অনুপ্রাস। এর সংযত ব্যবহার যেমন কাব্যশ্রী বর্ধন করে তেমনি আবার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের ফলে রচনা কৃত্রিমতাদুষ্ট হয়ে পড়ে। 'সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী'—রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রটির সঙ্গে দাশরথি রায়ের যে কোনো অনুপ্রাসবহুল কবিতার তুলনা করলে আমাদের মন্তব্যের ঔচিত্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকবে না। শেষোক্ত তিনটি অলংকার অনেকটা সমগোত্র এবং এগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয় হালকা অথবা বিদ্রূপাত্মক কবিতায়। শ্লেষ ও বক্রোক্তি দুয়েরই সামান্য লক্ষণ একই শব্দের উপর বিভিন্ন অর্থারোপ (ইংরেজী 'pun' এই ধরনের অলংকার), আর ব্যাজস্তুতির অর্থ স্তুতিচ্ছলে নিন্দা কিংবা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি। এই অলংকারগুলি কোনো উচ্চ ভাব বা গভীর আবেগেব ভার বহন করতে পারে না। দ্ব্যর্থবোধকতার দিক দিয়ে ইংরেজী 'irony'র সঙ্গে ব্যাজস্তুতির একটা বাহ্য সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু আয়রনি যেখানে মহৎ কাব্যকেও অলংকৃত করে ব্যাজস্তুতি সেখানে কথার মারপ্যাঁচ নিয়েই বিব্রত হয়ে থাকে। যে আয়রনি বাকচাতুর্যেই পর্যবসিত তার মধ্যেও ক্ষেত্রবিশেষে গভীরতর

ইংরেজীতে এই অলংকারের নাম 'synecdoche'। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বিবৃতি' কবিতাটি থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :

বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দু'পাশে,

....

মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন
নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন।

এখানে 'বুভুক্ষা' ও 'মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখে'র অর্থ বুভুক্ষু লোকের দল ও ধূর্ত, সুখী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। সমাসোক্তি ইত্যাদির সঙ্গে এই অলংকারের কোনো সম্পর্ক নেই।

অর্থের ব্যঞ্জনা থাকে। যেমন, ম্যাকবেথের প্রাসাদদুর্গে যখন ডানকানের আগমন আসন্ন তখন লেডি ম্যাকবেথ বলছে :

He that's coming
Must be provided for ....

উক্তিটির সরল অর্থ এই যে অতিথি সৎকারের সুব্যবস্থা হবে, কিন্তু আসলে ডানকান হত্যার ভয়াবহ পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এরূপ অর্থদীপ্ত আয়রনির পাশে ব্যাজস্তুতি অত্যন্ত নিষ্প্রভ, যথা ভারতচন্দ্র কর্তৃক নিন্দাচ্ছলে শিবস্তুতি :

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।

উপরে অলংকার সম্বন্ধে যা বলা হল তাকে বিষয়টির মুখবন্ধ বললেও বেশি বলা হবে। অনেক অলংকারের আমরা নামোল্লেখও করি নি, এবং যে কয়েকটি উল্লিখিত হয়েছে তাদেরও কোনোটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া আমরা সর্বত্র প্রচলিত সংজ্ঞাও মেনে চলি নি। এটা আমাদের ইচ্ছাকৃত। সব রকম অলংকারের গুণগান না করে আমরা শুধু এইটে প্রমাণিত কবার চেষ্টা করেছি যে কবিতা অলংকৃত হয় (সব সময়ে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই) সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে—লেখকের অনুভূতি প্রকাশের তাগিদে। তিনি যে অলংকার প্রয়োগ করছেন সে দিকে তাঁর খেয়ালও থাকে না, হয়তো বা অলংকারটির নাম, সংজ্ঞা ইত্যাদিও তাঁব কাছে অজ্ঞাত। রসজ্ঞ পাঠকও অলংকারতত্ত্ব না জেনে কবিতাটির মর্ম গ্রহণ করতে পারেন।

প্রেতের মত এক ধূসর বিষাদ
এইখানে থাকে (প্রেমেন্দ্র মিত্র)—

এই ছত্র দুটিতে কোন অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে—পূর্ণোপমা না লুপ্তোপমা না সমাসোক্তি—তা যদি তাঁর নাও জানা থাকে তবুও তিনি এইটুকু বুঝতে পারবেন বিষাদ এখানে প্রেতকল্প এবং এর উপর ব্যক্তিত্ব অধ্যাসিত হয়েছে। অলংকার সম্পর্কে লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ না

করে তিনি যদি শুধু এক নির্জন, বিষণ্ণ নদীতীরের রেখাচিত্র—যা কবিতাটিতে অঙ্কিত হয়েছে—তাঁর মানসপটে মুদ্রিত করে নিতে পারেন তা হলে তাঁর রসোপলব্ধি কোনো দিক দিয়েই বিঘ্নিত হবে না।

রূপকল্পনা (Imagery)

রূপকল্প ভাবের বাঙ্ময় চিত্রবিশেষ। উপমা, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার প্রত্যক্ষত চিত্রধর্মী, তবে অলংকারপ্রয়োগ রূপকল্প সৃষ্টির জন্য অবশ্য-করণীয় নয়।

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

এই শ্লোকটি কোনো অলংকারের দৃষ্টান্ত নয়, কিন্তু লজ্জায় অধোমুখী হয়ে পার্বতী লীলাকমলের পত্র গণনা করছেন—এই ছবিটি রূপকল্পনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

উপমার মত রূপকল্পের প্রাথমিক বৃত্তি কবির হৃদয়াবেগকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করে তোলা। প্রত্যেক লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই বৃত্তি সাধন করেন, এবং সেই জন্য রূপকল্পনায় প্রভূত বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। রূপকল্পের গতিপথ কখনও সরল, কখনও আবার অত্যন্ত সর্পিল।[১৩] কোনো কোনো কবির ইন্দ্রিয়বোধ এত তীক্ষ্ণ যে একই সময়ে তাঁর পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই যেন জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তখন তাঁর রচনাতে দেখা যায় রূপকল্পের বিচিত্র সমারোহ। জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতা (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) এই রকম 'চিত্ররূপময়'। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি থেকে কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধৃত করছি :

খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার

....

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে।

১৩। উপমা ইত্যাদির যে সব উদাহরণ আগে দেওয়া হয়েছে সেইগুলি লক্ষণীয়।

এখানে শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও রূপের মোহে কবি যেন আত্মহারা, তবুও আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইন্দ্রিয়প্রবাহ তাঁকে ঠিক ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি। কবিতাটির চিত্রবাহুল্য সত্ত্বেও মূল ভাবটি—যার করুণ মূর্ছনা শোনা যায় শেষ স্তবকে[১৪]—অস্পষ্ট হয়ে পড়ে নি। এবং তাইতেই 'চিত্ররূপ' ও সমগ্র কবিতাটির সার্থকতা।

রূপকল্প যদি ভাবোত্থিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে কবিতায় তার অনধিকারপ্রবেশ ঘটেছে। আর ভাব যেখানে দুর্বল সেখানে চিত্র-সমাবেশ রীতিমত দৃষ্টিকটু মনে হয়। যেমন ফিনিস ফ্লেচারের[১৫] লেখা এই তিনটি ছত্রে :

আমার প্রেমপূর্ণ বক্ষ পূজার বেদী,
আমার হৃদয় বলির পশু,
আর আমি নিজে পুরোহিত।

মাত্রাজ্ঞানের আরও মারাত্মক অভাব ঘটলে লেখকের অনভিপ্রেত হাস্যরসের সঞ্চার হয়।[১৬] সুকবিও সর্বত্র মাত্রা রক্ষা করতে পারেন না। রং ও রেখার অকৃপণ প্রয়োগের ফলে সুন্দর চিত্রকল্পও যে ভাবের প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় শেলির বহু-প্রশংসিত গীতিকবিতা 'ওড টু দ্য ওএস্ট উইণ্ড'এ। এর দ্বিতীয় স্তবকে পশ্চিমা বাতাসের তিনটি ছবি দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিতে বায়ু'প্রবাহে' ঝরা পাতার মতো নিক্ষিপ্ত হয়েছে ছিন্ন মেঘের দল, দ্বিতীয়টিতে ঐ প্রবাহ বায়বীয় তরঙ্গের নীলাভ বক্ষের আকার ধারণ করেছে, এবং তাতে ছড়িয়ে পড়েছে আসন্ন ঝটিকার অলকদাম,

---

১৪। আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে লাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ।

১৫। সতেরো শতকের ইংরেজ কবি।

১৬। একজন অজ্ঞাতনামা ইংরেজ কবির রচনায় এর নমুনা পাওয়া যায় :

আমি আর প্রেমের আনন্দময় বেদনা সহ্য করব না,
এবং তার পীড়াদায়ক শৃঙ্খলও বুকের পায়ে বাঁধব না।

'বুকের পায়ে'র টীকা নিষ্প্রয়োজন।

এবং পরিশেষে উদ্দাম ঝঞ্ঝা মৃতপ্রায় বৎসরের শোকসংগীতরূপে কল্পিত হয়েছে। ঐ প্রধান চিত্রত্রয়ের পাশে আবার একাধিক উপচিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং সব মিলিয়ে ফল দাঁড়িয়েছে অর্থবিভ্রম। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অসংলগ্ন চিত্রপুঞ্জ অর্থবিভব বর্ধিত করতে পারে। স্বামীকে হত্যাকার্যে প্ররোচিত করার জন্য লেডি ম্যাকবেথ বলছে :

Was the hope drunk
Wherein you dress'd yourself ? hath it slept since ?
And wakes it now, to look so green and pale
At what it did so freely ?

আশাকে কেন্দ্র করে এখানে পাঁচটি রূপকল্প সৃজিত হয়েছে। আশার মদোন্মত্ততা, নিদ্রা, জাগরণ ও বিবর্ণতা—এই চারটি চিত্র পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। কিন্তু এই আশাই যদি আবার ম্যাকবেথের পরিধেয় বস্ত্রে পরিণত হয় তাহলে সাধারণ বিচারে লেডি ম্যাকবেথকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হতে পারে। অথচ বাস্তবিকই এ রকম কোনো ধারণার সৃষ্টি হয় না নাটকীয় আবেগের তীব্রতার জন্যে। ভাবের পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষা এখানে নিতান্ত গৌণ ব্যাপার।

রূপকল্পনা ও প্রতীকতা

আমরা এ যাবৎ যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছি সেগুলি অধিকাংশ স্থলে উপমারই দৃষ্টান্ত। বস্তুত রূপকল্পনার প্রধান অবলম্বন তুলনামূলক অলংকার। এই তুলনা যখন সমগ্র কবিতাতে পরিব্যাপ্ত হয় অথচ অর্থ থাকে প্রচ্ছন্ন রূপে তখন সেই কবিতার নাম দেওয়া হয় রূপক। রূপককে পরোক্ষ তুলনা না বলে বর্ণিত বিষয় ও প্রচ্ছন্ন অর্থের সমীকরণও বলা চলে। রূপকল্পটি সর্বতোভাবে ঐ অর্থের অথবা কবির প্রত্যয়ের (concept) অনুসারী, এবং এদিক দিয়ে রূপক ও উপমার মধ্যে কোনো তফাত নেই। অলংকার দুটি বর্ণালীর সহিত তুলনীয়—অর্থরশ্মি এদের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রতীকধর্মী কবিতার রূপকল্প কিন্তু স্বকীয় আলোকে প্রতিভাসিত, কারণ রূপকল্প এখানে প্রতীকবিশেষ, এবং প্রতীকটিই রচনার মর্মকেন্দ্র। সাধারণত সুগভীর আত্মচৈতন্য প্রকাশের জন্যে কবিরা প্রতীকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবনের কোনো পরম সত্য—জন্ম, মৃত্যু, অমরতা, হর্ষ, বেদনা, ভীতি অথবা রিক্ততা—যখন তাঁদের চিত্তকে আলোড়িত করে তখন তাঁরা তার অবিকল প্রতিমূর্তি খুঁজে পান কোনো বহির্বস্তুর মধ্যে। মহাসমুদ্রের সৃজন তথা ধ্বংসলীলা, চন্দ্রের গতিবেগ ও পরিবর্তনশীলতা, নদীপ্রবাহ, জোয়ার-ভাটা, বীজের মৃত্যু ও অঙ্কুরোদ্গম, সূর্যের উজ্জীবনশক্তি—সবই তখন তাঁদের দৃষ্টিতে রহস্যময় অর্থে ভূষিত, এবং এদের সঙ্গে তাঁরা যেন সাহজিক প্রবৃত্তির বশে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেন। উপমা আলোচনা প্রসঙ্গে যে সম্পর্কের কথা বলেছি সেই সম্পর্ক এখানে নিবিড়তর। মানুষ, প্রকৃতি ও চৈতন্যের অখণ্ডতা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধ হলে তবে ঐ সম্পর্কস্থাপন সম্ভবপর হবে। প্রতীকরূপী শব্দবিশেষের সুষ্ঠু প্রয়োগ কবিতার ভাবৈশ্বর্য বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু তাতে প্রতীকতার উৎপত্তি হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রশস্তিগায়ক রুপার্ট ব্রুক একটি সনেটে সৈনিকদের কর্মচঞ্চল জীবন ও গৌরবময় মৃত্যুকে তুলনা করেছেন যথাক্রমে সৌরকরোজ্জ্বল তরঙ্গমুখর সমুদ্র ও তুহিন রাত্রির প্রশান্ত সমুদ্রের সহিত। তুলনা হিসাবে চিত্র দুটি অনিন্দনীয়, কিন্তু প্রতীকতার কোনো চিহ্ন এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। এমনি অনেক সময়ে বলা হয় এই বস্তুটি অমুক ভাবের প্রতীক,[১৭] কিন্তু 'প্রতীক' শব্দটিই এখানে অপ্রযোজ্য। কবিতার অন্তর্গত প্রতীকের বিশেষত্ব এর সর্বময়ত্ব, মূল ভাবের অনুষঙ্গ হিসাবে এর অবস্থিতি অভাবনীয়।

আদিম প্রতীক বা প্রতীকের 'আদিরূপে'র কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি। কালের দুস্তর ব্যবধান প্রাচীনতম প্রতীকেরও

১৭। যেমন ফুল, নদী ও সাপের সঙ্গে যথাক্রমে প্রেম, পবিত্রতা বা সৌন্দর্য, জীবনপ্রবাহ ও ক্রূরতার ভাব যুক্ত হয়।

কাব্যোপযোগিতা লাঘব করতে পারে না, যদি বাস্তবিকই কবির চৈতন্য এর দ্বারা গভীর ভাবে বিচলিত হয়। তাঁর বিশেষ মানসিক পরিস্থিতি প্রতীকটিকে নবজন্ম দান করে এবং তখন যেন অতীতের ধারা এসে মিলিত হয় বর্তমান জীবনস্রোতের সঙ্গে। এলিয়টের ভাষায় মহৎ কবি সেই 'স্তব্ধ কেন্দ্রে'র অনুধ্যান করেন—যেখানে তিনি অন্তত মুহূর্তের জন্য ত্রিকালজয়ী হয়ে মহাকালের সমীপবর্তী হতে পারেন। তখন তাঁর এই প্রতীতি জাগে যে

Time past and time present
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.

আদিম প্রতীকগুলি মানুষের আদিম অভিজ্ঞতা এবং সমষ্টিগত নির্জ্ঞানের (collective unconscious) চিত্ররূপ। সেই সুপ্তপ্রায় নির্জ্ঞান আজও মাঝে মাঝে আমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠে এবং তখন মনে হয় অতি প্রাচীন অভিজ্ঞতা এই একান্ত বাস্তব উজ্জ্বল মুহূর্তটিতে সমুপস্থিত। বহু মানুষের বহুতর অভিজ্ঞতা দিয়ে যা গঠিত হয়েছে তারই মধ্যে খুঁজে পাই অসংখ্য অর্থের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। ইয়েটস এই ভাবটি অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন :

It is only by ancient symbols, by symbols that have numberless meanings beside the one or two the writer lays an emphasis upon, or the half-score he knows of, that any highly subjective art can escape from the barrenness and shallowness of a too conscious arrangement, into the abundance and depth of nature. The poet of essences and pure ideas must seek in the half-lights that glimmer from symbol to symbol, as if to the ends of the earth, all that the epic and dramatic poet finds of mystery and shadow in the accidental circumstances of life.

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন : 'আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্মৃতি কোন বৃহৎ স্মৃতির অংশমাত্র—যে স্মৃতি যুগে যুগে পৃথিবীকে ও মানুষের চিন্তাকে নূতনত্ব দান করে।' ঐতিহ্যমূলক প্রতীকতা যে চিরন্তন সত্যটি উদঘাটিত করে সেটি হচ্ছে মানবীয় চেতনার সন্ততি। কবি

ব্যক্তিগত প্রতীকও প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি এর উপর এমন একটি কূটস্থ অর্থ আরোপ করেন—যা তাঁর নিজস্ব টীকা ছাড়া অপরের অনধিগম্য হয়ে পড়ে—তা হলে তাঁর প্রতীকতা সৃষ্টির সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হবে।[১৮]

প্রতীকী কাব্য হিসাবে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' বোধ হয় অতুলনীয়। প্রেমানুভূতি এখানে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে, এবং এই আধ্যাত্মিক বোধের প্রতীক তাঁর প্রেমাস্পদ বিয়াত্রিচে। উনিশ ও বিশ শতকের কাব্যেও প্রতীকতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা স্পষ্টত প্রতীকধর্মী। তাঁর প্রতীকগুলি গৃহীত হয়েছে প্রধানত ভারতীয় ভাবধারা ও পল্লীপ্রকৃতি থেকে। নদীমাতৃক শস্যশ্যামল বাঙলা দেশ থেকে তিনি পেয়েছেন 'নদী', 'তরী' ও 'মাঝি'র প্রতীক এবং এগুলি যে ভাবের চিত্ররূপ সেটি বাঙালী হৃদয়েরই চিরন্তন ভাব। 'সোনার ধান' ('সোনার তরী') তাঁর মৌলিক অনুভূতির দ্যোতক কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ঐতিহ্যের সঙ্গেও সংস্পৃষ্ট।[১৯] 'জীবনদেবতা' ও উর্বশী'র প্রথম আবির্ভাব তাঁর ব্যক্তিমানসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা অধিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বমানবের হৃদয়ে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের বিগ্রহরূপিণী উর্বশী "'ভুবন'মোহিনী"—

'জগতের' অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
'ত্রিলোকের' হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা।

শেলির কবিতাতেও 'নদী', 'মেঘ', 'প্রস্রবণ', 'সমুদ্র', 'তরী', 'গুহা', 'সর্প' প্রভৃতি প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে।[২০] আধুনিক কালে ইয়েটসের প্রতীকতা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁর কাব্যের মূল প্রতীক সর্পিল অথবা

১৮। প্রথম অধ্যায়ে ফরাসী প্রতীকী কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৯। তুলনীয় : রামপ্রসাদের 'মন রে কৃষি-কাজ জান না। এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা'।

২০। জলধারা জীবনের, গুহা বাস্তববিমুখ জীবনের ও সাপ বুদ্ধির প্রতীক। এই বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ কুসংস্কার ও নির্যাতনের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করে।

চক্রাকারে ঘূর্ণমান কোনো বস্তু (যেমন সিঁড়ি)। তাঁর মতে জীবন সর্বদা ঊর্ধ্বগামী, কিন্তু সর্পিল সোপানশ্রেণী অতিক্রম না করলে ঊর্ধ্বগমন সম্ভব হয় না। বৃত্তাকারে চলতে হয় বলে আমাদের গতি অত্যন্ত মন্থর, তবুও আমরা এগিয়ে চলি। বৃত্তের পরিধি ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং শেষে যখন আমরা উপরে গিয়ে পৌঁছই তখন দেখি বৃত্তটি বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যে মিনার আমাদের গন্তব্যস্থল সেটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং সেখানে বার্ধক্য ও মৃত্যু এসে আমাদের গ্রাস করে। কালের বন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে জীবনের এই অসংগতি দূরীভূত হবে না। সমসাময়িক বাঙলা কাব্যে রূপকল্পের অভাব নেই, কিন্তু বিষ্ণু দে ছাড়া প্রতীকতার দিকে কেউই বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নি।[২১]

ছন্দ (Metre) ও ছন্দস্পন্দ (Rhythm)

কবিতার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকরণ হচ্ছে ছন্দ, কারণ আপাত দৃষ্টিতে ছন্দই কবিতাকে কাব্যধর্মী নাটক ছাড়া সাহিত্যের অন্য সর্ববিধ রূপ থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। আমাদের বর্তমান আলোচনাতে 'ছন্দ' শব্দটির অর্থ পদ্যবন্ধ (metre) আর কবিতায় যে ধ্বনিঝংকার থাকে সেটি সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য 'ছন্দস্পন্দ'[২২] (rhythm) কথাটি ব্যবহার করেছি। বাঙলায় 'ছন্দ' কথাটি এই দু রকম অর্থেই প্রযুক্ত হয় কিন্তু কবিতার প্রকরণ হিসাবে পদ্যবন্ধ ও ধ্বনিঝংকার দুই-ই এত গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি স্বতন্ত্র অভিধা প্রয়োগ করাই যুক্তিসংগত, অন্যথা বিচারবিভ্রাট ঘটতে পারে।

ছন্দ ও ছন্দস্পন্দের মধ্যে অবশ্য প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। ছন্দ ছন্দস্পন্দেরই একটি বিশিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপ। সুতরাং ছন্দস্পন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে ছন্দের স্বরূপ সম্পর্কেও আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারব। ইংরেজী 'রিদ্‌ম্‌' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'প্রবাহ' অর্থাৎ গুরু ও লঘু ধ্বনির (সিলেবল)

২১। বিষ্ণু দের দুটি প্রিয় প্রতীক তুরঙ্গ ও সমুদ্র।

২২। শব্দটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন প্রবোধচন্দ্র সেন।

মাত্রানুগ বিন্যাস। এই বিন্যাসই ধ্বনিপ্রবাহের মূল কারণ। বাঙলা ও ইংরেজী ছন্দপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, তবুও ধ্বনিময়তার দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, এবং শুধু ইংরেজী ও বাঙলা কবিতা নয়, পৃথিবীর সব দেশের কবিতাতেই এইরূপ ধ্বনিস্পন্দন অনুভব করা যায়।

ছন্দস্পন্দকে কবিতার প্রাণশক্তির উৎস বললে অতিকথনের অপরাধ হবে না। মাঝে মাঝে কোনো বিশেষ ভাব গানের সুরের মতো অনেকটা অতর্কিতে কবির কানে বেজে ওঠে, এবং তখন যে কবিতার সৃষ্টি হয় তাকে ঐ সুরেরই বিস্তার বলা চলে। এলিয়ট এই প্রসঙ্গে 'শ্রুতি-কল্পনা' (auditory imagination) কথাটি প্রয়োগ করেছেন। 'দ্য মিউজিক অব পোএট্রি'তে তিনি বলেছেন : I know that a poem or a passage in a poem may tend to realize itself first as a particular rhythm before it reaches expression in words, and that this rhythm may bring to birth the idea and the image. উক্তিটির মর্মার্থ এই যে সৃজনক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর হল একটি বিশেষ রিদ্‌ম্‌, যা শব্দ বা অর্থের সঙ্গে অসম্পৃক্ত হয়ে কবির চেতনাকে স্পন্দিত করে এবং এই রিদ্‌ম্‌কে কেন্দ্র করেই কবিতাটি গড়ে ওঠে। এলিয়ট এখানে স্পষ্টত ফরাসী প্রতীকবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বদলেয়ার ও তাঁর উত্তরসাধকেরা কবিতার সাংগীতিক উপাদানকেই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতেন এবং যেহেতু ছন্দস্পন্দ প্রত্যক্ষভাবে সংগীতধর্মী সেই হেতু তাঁরা ছন্দস্পন্দকেই কবিতার আত্মা মনে করতেন।[২৩] এলিয়টও অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ছন্দস্পন্দের জয়গান করেছেন এবং পাছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ জাগে সেইজন্য উল্লিখিত মন্তব্যের সঙ্গে তিনি এই বাক্যটি যোগ করে দিয়েছেন : 'I do believe that this is

২৩। প্রতীকী আন্দোলন সম্পর্কে আর্থার সাইমন্স বলেছেন : 'ছন্দস্পন্দ হচ্ছে সক্রিয় আত্মা, এবং এরই দ্বারা চালিত হয়ে শব্দপরম্পরা (কবিতার) বাণীকে মূর্তিদান করে।'

an experience peculiar to myself.' কিন্তু ভাবনিরপেক্ষ ধ্বনির সঞ্চার আমাদের মনে হয় কষ্টকল্পনা। ধ্বনি আসে অন্তত ভাবের বীজ বহন করে, এবং সেই বীজের অঙ্কুরোদ্গমেই কাব্যরচনার শুরু। ধ্বনির প্রভুত্ব বেশী বলে হয়তো প্রথম অবস্থায় ভাব ঠিকমত প্রতীত হয় না কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভাব এখানে অবর্তমান।[২৪]

ছন্দস্পন্দ আত্মপ্রকাশ করে শব্দকে আশ্রয় করে। প্রত্যেক কবিতার ছন্দস্পন্দের একটা সমগ্র রূপ (pattern) থাকে—যার ক্ষুদ্রতম অংশ একটি ধ্বনিময় শব্দ বা শব্দাংশ। যে সব শব্দাংশের উপর জোর দেওয়া হয় সেইগুলিই ধ্বনিময় হয়ে ওঠে, আর বাকী অক্ষরসমষ্টি থাকে নিম্নগ্রামে বাঁধা। ধ্বনির এই উত্থানপতন ছন্দস্পন্দের মূল কথা। সব শব্দাংশই যদি একই গ্রামে বাঁধা হয় তাহলে বিচিত্র সুরসংগতির বদলে শোনা যাবে একটানা উচ্চ বা অনুচ্চ রব। ছন্দস্পন্দেব যে গুণটি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে ধ্বনির পৌনঃপুন্য। এই পৌনঃপুন্য আমাদের মনে একটা প্রত্যাশা জাগায় কিন্তু প্রত্যাশিত ধ্বনি সব সময় পুনরায় ঝংকৃত হয় না এবং হওয়া উচিতও নয়। দু-চার লাইনে যখন এটা সীমাবদ্ধ থাকে তখন কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে না, যেমন রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তি দুটিতে—

দুকূখের বরষায় চক্ষুখের জল যেই নামলো
বক্ষেব দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলো।

২৪। রবীন্দ্রনাথের 'লিপি' ('পূরবী') একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা। এই ছন্দ কিন্তু ভাববর্জিত নয়। কবিতাটিব উৎপত্তি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব-আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথা আপনিই ভেসে উঠল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে।

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো-একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে' ('পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি')।

এখানে সময়বিভাগ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট বলে ধ্বনিবিন্যাস[২৫] খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কোনো কবিতায় যদি আগাগোড়া এই ভাবে ধ্বনি বিন্যস্ত করা হয় তা হলে সেটা নিশ্চয় একঘেয়ে ও শ্রুতিকটু মনে হবে, এবং সেইজন্য ছন্দস্পন্দের রূপ অবিকৃত রেখে কবি ওরই মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেন। 'একত্ব ও নূতনত্বের সমন্বয় হচ্ছে ছন্দস্পন্দের প্রাণস্বরূপ। ফলে আসল রূপের ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ অংশগুলির বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব থেকে বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব হয়। (একই ধ্বনির) পৌনঃপুনিকতা ছন্দস্পন্দকে বিনষ্ট করে, যেমন করে পার্থক্যজনিত বিভ্রান্তি। স্ফটিকখণ্ড ও কুয়াশা দুই-ই ছন্দোহীন— প্রথমটি অত্যধিক ঐক্যবদ্ধতার জন্য এবং দ্বিতীয়টি বৈচিত্র্যের জন্য' (হোআইটহেড)।

ধ্বনিবৈচিত্র্য নির্ধারিত হয় কবির হৃদয়াবেগের দ্বারা। একক অনুভূতির মধ্যেও কিছু না কিছু বৈচিত্র্য থাকে এবং তদনুযায়ী অনিবার্যভাবে ধ্বনিও বদলে যায়। প্রত্যেক কবিতাতে আমরা দেখি ভাবের উপযোগী একটা পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে শব্দ, ছন্দ, ছন্দস্পন্দ ইত্যাদির সহায়তায়। এখানে শব্দ পরিণত হয়েছে ধ্বনিতে, কিন্তু সে ধ্বনি আবেগেরই ধ্বনি।

কাব্যপাঠের সূচনায় ধ্বনির আকর্ষণে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় এত সজাগ হয়ে ওঠে[২৬] যে আবেগের দিকে আমাদের তেমন খেয়াল থাকে না, কিন্তু শুধু শ্রবণশক্তির সাহায্যে হৃদয়ভাবের আঁকাবাঁকা গতিপথ আমরা অনুসরণ করতে পারি না। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে ছন্দস্পন্দ নিছক ধ্বনির ব্যাপার নয়, এবং সেই কারণে যে

২৫। প্রস্বরিত ধ্বনিগুলি ('দুঃখ্', 'চখ্', 'নাম্' ইত্যাদি) আমরা মোটা হরফে দিয়েছি।

২৬। সংস্কৃত 'শ্রব্যকাব্য' কথাটি এই হিসাবে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। মুদ্রাযন্ত্রের যুগে অবশ্য আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে না। তবুও যখনই কোনো কবিতা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে তখন সেটিকে অন্তত গুনগুন করে না পড়ে আমরা যেন ঠিক তৃপ্তি পাই না।

ধ্বনি আমরা আশা করি তার পুনরাবৃত্তি অবশ্য ঘটনীয় নয়। আশাভঙ্গের ফল কিন্তু এখানে বেদনাদায়ক নয়, বরং অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ধ্বনি আনন্দ ও বিস্ময়বোধের সঞ্চার করে।

ধ্বনিপরম্পরা যে প্রত্যাশা, পরিতৃপ্তি, আশাভঙ্গ ও বিস্ময়ের কারণ স্বরূপ তাদেরই সংগঠনকে রিচার্ডস বলছেন ছন্দস্পন্দ। এরই একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রিত রূপ হচ্ছে ছন্দ। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ছন্দ নানা রকম নিয়মের দ্বারা বদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছন্দের এই নিয়মানুগত্য নিতান্তই আপেক্ষিক ব্যাপার। গদ্যের তুলনায় কবিতার ভাষা সংযত এবং শব্দসমষ্টির অনুবন্ধও অতিশয় দৃঢ়, তবুও ছন্দস্পন্দের মতোই ছন্দও প্রত্যাশা, উত্তেজনা, বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করে। মোট কথা, নিয়মের কাছে নতি স্বীকার করেও কবি স্বচ্ছন্দ বিহারে সমর্থ হন। তিনি নিয়ম মেনে চলছেন এবং সেইজন্য আড়ষ্ট হয়ে আছেন এ রকম কোনো সন্দেহের উদয় হয় না। মনে রাখা দরকার যে ছন্দ ছাঁচের মতো হলেও ঠিক পুতুলগড়া ছাঁচ নয়। কবির যা প্রধান দায়িত্ব— অর্থাৎ তাঁর শিল্পকর্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা—যান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে, ছন্দকে শুধু রীতি হিসাবে গ্রহণ করে, তিনি নিশ্চয় তা পালন করতে পারেন না।

ছন্দের বিচার করা উচিত কবির প্রকাশধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে। কবিতার মধ্যে যখন আমরা আবেগের কম্পন অনুভব করি তখনই বুঝি তাঁর প্রকাশকার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। কবিকে সেই কম্পন সৃষ্টি করতে হয় শব্দের সাহায্যে, অথচ শব্দ স্বভাবতই বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থের জ্ঞাপক। সুতরাং কবিকে ঐ অর্থকে নিয়ে যেতে হয় রসের পর্যায়ে এবং সেটা শব্দের স্থূল প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ছাড়া সম্ভবপর হয় না। এই পরিবর্তন সাধনের অন্যতম উপায় হল ছন্দ—এবং ছন্দস্পন্দের—সুনিপুণ প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে গতিবেগ যখন আবেগের (কবিতা এই আবেগেরই প্রকাশ) ধর্ম তখন কথার মধ্যে ঐ বেগ সঞ্চারিত করতে না পারলে 'আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল' ঘটবে না। এই মিল ঘটানোর জন্যই

ছন্দের প্রয়োজন। কথা যখন বেগবান হয় তখন সে তার 'জড়ধর্ম' থেকে মুক্তি লাভ করে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে, অতএব ছন্দের বাঁধন 'কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি'।[২৭]

শুধু প্রকরণ হিসাবেই ছন্দ যখন কবিতার উপর ভর করে তখন অবশ্য এটা ভিতরে বাহিরে দু দিকেই বন্ধনস্বরূপ হয়ে পড়ে। যাঁর হৃদয়াবেগ অত্যন্ত অগভীর কিংবা মস্তিষ্কচালনাই যাঁর একমাত্র কাম্য তাঁর ভাগ্যেই এই রকম বিড়ম্বনা ঘটে। কেউ কেউ আবার ছন্দের লীলাবৈচিত্র্যে এত মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে কবির যা আসল কৃত্য—ভাব ও ছন্দের একীকরণ—সে দিকে তাঁদের বিশেষ মনোযোগ থাকে না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা বোধ হয় অশোভন হবে না। তিনি ইংরাজী, ফারসী, জাপানী, ফরাসী, ও সংস্কৃত কাব্য থেকে অনেক ছন্দ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের নিয়মানুগ প্রয়োগে সিদ্ধকামও হয়েছিলেন, কিন্তু সর্বত্র তিনি ভাব ও ছন্দকে একত্র গ্রথিত করতে পারেন নি।[২৮] সার্থক কবিতায় আমরা দেখতে পাই ছন্দপ্রকরণ রূপান্তরিত হয়েছে ভাববস্তুর একটি বিশিষ্ট উপাদানে এবং আন্তর ভাবই এখানে বহির্বিধানের নিয়ামক। ছন্দের মূল কাঠামোর উপর হস্তক্ষেপ না করে কবি ওরই মধ্যে মাত্রা, ধ্বনি

২৭। 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'—এই পদটির রবীন্দ্রনাথ যে ছান্দসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে: 'শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মালো তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই, সেইজন্যে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না।' ('ছন্দ')।

২৮। কয়েকটি চিত্রপ্রধান কবিতা—যেমন 'হেমন্তে' ('ফুলের ফসল') 'পাল্কীর গান', 'ভাদ্রশ্রী' ('কুহু ও কেকা')—সম্পর্কে অবশ্য এ কথা খাটে না। "'পাল্কীর গান' যেন খর গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের পল্লীপ্রকৃতির রূপবাণী।" (সুকুমার সেন)।

ইত্যাদির ঈষৎ পরিবর্তনের দ্বারা অনুসৃত ছন্দোরীতিকে এমনই একটা অনন্যতা দান করেন যে মনে হয় এটি যেন তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি।

আধুনিক কাব্যে যে ছন্দবিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার একটা চলনসই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ছন্দ ভাবকে দেয় শৃঙ্খলা ও সংহতি, কিন্তু আধুনিক মনোভাব এতই বিশৃঙ্খল যে ছককাটা ছন্দের মধ্যে তাকে উপস্থাপিত করলে তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য প্রচলিত ছন্দোরীতি অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয় কিন্তু স্বধর্মনিষ্ঠ কোনো কবিই ছন্দোরাজ্যে ঠিক অরাজকতা সৃষ্টি করার পক্ষপাতী নন। প্রত্যেকেই ছন্দস্পন্দকে নিয়ন্ত্রিত করে হৃদয়ভাবকে একটা সংহত রূপ দেবার চেষ্টা করেন। চিত্তবিক্ষোভ যেখানে প্রশমিত সেখানে প্রচলিত পদ্যবন্ধ, এমন কি মিল ব্যবহারেও তাঁর আপত্তি নেই। 'দ্য ক্রিয়েটিভ এক্সপেরিমেন্ট' নামক সমালোচনাগ্রন্থে সি. এম. বাওরা এর একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন এলিয়টের 'লিটল গিডিং' থেকে। কবিতাটির সূচনাতে দেখা যায় এলিয়টের স্বাভাবিক ছন্দস্পন্দ ও স্বাধীনতা। ভাবের গতি এখন অসমান, ছন্দের গতিও তদ্রূপ। কিন্তু পরে তিনি নিয়মিত মিল ও ছন্দোরীতি দুইই অবলম্বন করেছেন :

Who then devised the torment ? Love.
Love is the unfamiliar Name
Behind the hands that wove
The intolerable shirt of flame
Which human power cannot remove.
    We only live, only suspire
    Consumed by either fire or fire.

এই বিশেষ মুহূর্তটিতে কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব যেন অবসিতপ্রায়। এখন তাঁর সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি সুগম্ভীর, সাংগীতিক মনোভাবের উদ্রেক করেছে এবং এর অকৃত্রিম প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ঐতিহ্যসম্মত মিল ও পদ্যবন্ধ, মুক্তবন্ধ ছন্দ এখানে অব্যবহার্য। এলিয়ট এখানে যা করেছেন অবস্থা অনুযায়ী অন্যান্য আধুনিক কবিও তাই

করেন। প্রচলিত বা অপ্রচলিত কোনো রীতির প্রতি তাঁদের অহেতুক আসক্তি নেই, শিল্প ও আধুনিকতার দোহাই দিয়েও তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন না। বিষয় ও মেজাজের উপযোগী রূপকলা নির্বাচনই তাঁরা একমাত্র কর্তব্য মনে করেন এবং যেহেতু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে রূপকলা অনেক সময়ে স্বয়ংনির্বাচিত সেইজন্য প্রাচীন অর্বাচীন কোনো পদ্ধতির প্রতিই তাঁরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন নন। তবে বর্তমান খণ্ড চৈতন্য মুক্তবন্ধ ছন্দে সুচারুরূপে অভিব্যক্ত হয় বলে এই ছন্দের বহুল প্রয়োগ আজকাল অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

কবিতার ইতিহাস

এতক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কাব্যস্বরূপ এবং বিষয়টি আমরা ভূমিকাতে উত্থাপিত ও প্রথম অধ্যায়ে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করে পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে কবিতার উদ্দেশ্য, রূপ ও প্রকরণ বিচারকালে বিভিন্ন দিক থেকে এরই উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। আমাদের বক্ষ্যমান প্রসঙ্গ কবিতাব ইতিহাস, অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কবিতা যে ভাবে বিবর্তিত হয়েছে তারই ধারাবাহিক বৃত্তান্ত। ধারাবাহিকতা অবশ্য সর্বত্র—এমন কি একই দেশের কাব্যেতিহাসে—সব সময়ে দৃশ্যমান নয়। তবুও প্রত্যেক দেশেই ঐতিহ্যধারা সর্বদা প্রবহমান থাকে—কখনও প্রকাশ্যভাবে, কখনও আবার অন্তঃসলিলা নদীব মতো এবং ঐ ধারার অনুবর্তী হয়েই আমাদের কাব্যেতিহাসের দিঙনির্ণয় কবতে হবে। বিভিন্ন দেশের কাব্যেব মধ্যেও মাঝে মাঝে ভাব-ও রীতি-গত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় এবং তার কারণ মানুষের হৃদয়ভাবের একত্ব, কোনো বিশেষ সাংস্কৃতিক, সমাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক ভাবের বিপুল প্রসার, অথবা দেশগুলির সান্নিধ্য ও পারস্পরিক প্রভাব।

ভারতবর্ষ ও ইউরোপের আদিতম কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে ঋগ্বেদ ও হোমারের 'ইলিয়ড'। কাব্য-ঐতিহ্যের সূচনা এইখানে, কিন্তু রচনা দুটিতে যখন আমরা কবিত্বগুণের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাই তখন আমরা বুঝতে পারি যে একটি প্রাচীনতর ঐতিহ্য তথাকথিত আদিকবিদের কাব্যরচনার পথ সুগম করে দিয়েছিল। এ ঐতিহ্যের কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ নেই। বেদপূর্ব সমস্ত রচনা আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, এবং সেইজন্য কবিতার জন্মকথা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৃবিদ্যা, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা ও ভাষাবিদ্যার সাহায্যে সমস্যাটি

আংশিকভাবে মীমাংসিত হতে পারে। অনেকে এ কার্যে ব্রতীও হয়েছেন, কিন্তু কেউই এ পর্যন্ত কোনো অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

জাদু ও ধর্মকৃত্য (ritual) থেকে কবিতা উদ্ভূত হয়েছে এই মতটি সর্বাধিক সমর্থন লাভ করেছে। আমরা অনুমান করতে পারি যে কবিতা জন্মগ্রহণ করেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে। আদিম অরণ্যচারী মানব তখন সবেমাত্র যন্ত্রী হয়েছে—পাথরের যন্ত্র দিয়ে সে অতিকায় জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে আত্মরক্ষা করতে শিখেছে। খাদ্যোপযোগী পশুমাংস সংগ্রহ কষ্টসাধ্য হলেও তখন আর অসম্ভব নয়। পরে তার যান্ত্রিক শক্তি আরও বেড়ে গেল এবং তার ক্রমোন্নতি হল শিকারজীবন থেকে সাম্যসমাজনিয়ন্ত্রিত কৃষিজীবনে। অনেক ক্ষেত্রে শিকার ও কৃষি, এই দু রকম উপায়েই জীবিকা অর্জিত হত। সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার না করে সে প্রকৃতিকে সাধ্যমত নিজের বশে আনার চেষ্টা করলে। মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় অধ্যায়, কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুর ও দুর্জ্ঞেয় লীলার কাছে মানুষ এখনও অসহায়। এই অসহায় ভাব এবং এর দূরীকরণের প্রয়াস থেকেই জাদুবিদ্যার উৎপত্তি। যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী বা শক্তির কাছে মানুষ পরাভূত তারই উপর সে কাল্পনিক (তার কাছে কাল্পনিক নয়) উচ্চতর শক্তি আরোপ করে তাকে দমন করার চেষ্টা করত। ঐ আরোপণই জাদুক্রিয়া। নৃত্য, গীত বা জাদুমন্ত্র উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হত, এবং গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার্থে একাধিক ব্যক্তি এতে অংশ গ্রহণ করত। বৃষ্টির প্রয়োজন হলে কোনো বিশেষ নৃত্য অনুষ্ঠিত হত এবং নর্তকের দল মেঘের সমাবেশ, বজ্রধ্বনি ও বৃষ্টিপাতের অনুকরণ করত।[১] ঐ জাতীয় অনুষ্ঠান কতকটা প্রতীকধর্মী, এবং

১। জর্জ টমসনের 'মার্কসিজম অ্যাণ্ড পোএট্রি' দ্রষ্টব্য। পনেরো কুড়ি বৎসর আগে পশ্চিম বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণীর মুসলমানেরা অনাবৃষ্টির সময়ে —অতটা চমকপ্রদভাবে না হলেও—পর্জন্যদেবকে খুশী করবার চেষ্টা করত।

আদিম জগতের অধিবাসীরা নাম ও নামীর, প্রতীক ও প্রতীকিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পেত না। যে বস্তুর উপর তারা আধিপত্য বিস্তার করতে চাইত তার নামোল্লেখ করলেই কার্যসিদ্ধি হবে, এই রকম একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস নিয়ে তারা জাদুক্রিয়ায় লিপ্ত হত। অনুকৃত মেঘ, বজ্র ও বৃষ্টি তাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য—জাগ্রত স্বপ্ন বা মায়া নয়। মিলিত কর্মপ্রচেষ্টাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য তারা যৌথভাবে এই সব অনুষ্ঠান পালন করত। জীবিকা অর্জন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও জাদুবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করা হত। একটি ভারতীয় জাদুমন্ত্রের কিয়দংশ এইরূপ :

লাফিয়ে চলো আমার জাদুমন্ত্র,
প্রেম জাগাও এই মেয়েটির মনে
প্রেম তার চলন্ত পায়ে
প্রেম তার পায়ের ধুলোতে
প্রেম তার চোখের দৃষ্টিতে
প্রেম তার চঞ্চল চোখের পাতায়।[২]

জাদুবাক্যগুলির ভাষা সুললিত না হলেও খুব জোরালো, এবং তার কারণ ছন্দস্পন্দের[৩] প্রয়োগ। তৎকালীন কথ্য ভাষার তুলনায় এই ভাষা নিঃসন্দেহে উন্নত ও প্রকাশক্ষম। সাম্যসমাজের বিধান এবং প্রয়োজন অনুসারে তখন সবাইকে একযোগে কাজ করতে হত এবং

তারা পাডায় পাডায় ঘুরে বেডাত এবং মাটিতে জল ঢেলে কাদায় গডাগডি দিতে দিতে তারস্বরে চীৎকার করত :

হাদা মেঘের ভাদা পানি
পানি দিবি তো দে
নইলে তোদের লাল বিবিকে দে।

স্থূল রসিকতাটুকু লক্ষণীয়। এ রীতির এখনো চলন আছে কিনা জানা নেই।

২। ভেরিয়ার এলউইনের 'ফোক সংস অব ছত্তিসগড' থেকে গৃহীত।

৩। 'ছন্দস্পন্দ' কথাটা এখানে আমরা rhythm (তাল) অর্থে প্রয়োগ করছি।

তালে তালে কাজ করলে যে পরিশ্রমের লাঘব হয় এটা তারা সহজ বুদ্ধিতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। এখনও আমরা দেখতে পাই কোনো কোনো শ্রমসাধ্য কার্যসম্পাদনের সময়ে শ্রমিকেরা একঘেয়ে সুরে এবং তালে তালে কয়েকটি কথা বলে যায় এবং সেই সঙ্গে কাজ চলতে থাকে।[৪] কৃষিবিষয়ক পল্লীগীতি, মাঝির গান, সারি গান ইত্যাদিও অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সব গানের সুর অবশ্য অনেক বেশী শ্রুতিমধুর, কিন্তু সুর ছাড়া এদের মধ্যে যে ধ্বনিময়তা রয়েছে সেটি আদিম মানবের অসম্বদ্ধ বাক্যসমষ্টির ছন্দস্পন্দের সঙ্গে তুলনীয়। একটু আগে আমরা বলেছি ছন্দস্পন্দ মানুষের কর্মভার লাঘব করত—কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এরই মধ্যে সম্ভবত কবিতার বীজ নিহিত ছিল।

ভাষার ক্রমবিকাশ তিনটি স্তরের দ্বারা চিহ্নিত। আদিম ভাষা অনুকৃতিমূলক ও জাদুশক্তিসম্পন্ন, শব্দ ও বস্তু এখন অভিন্ন। কোনো বস্তুর নামোল্লেখ ও সেই নামের পুনরাবৃত্তি বস্তুটির উপর একটা রহস্য-জনক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয় স্তরে এসে ভাষা কবিত্বগুণে মণ্ডিত হয়। এই অবস্থায় অনুকৃতিমূলক নামগুলির আর জাদুশক্তি থাকে না, কিন্তু সেগুলি উপমাত্মক ও আবেগপ্রধান হয়ে ওঠে বলে আদিম জাদুবাক্য ও এই নবীন কাব্যভাষার মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে না। জর্জ টমসন কিটসের 'ব্রাইট স্টার, উড আই ওঅ্যার স্টেডফাস্ট অ্যাজ দাউ আর্ট' শীর্ষক কবিতা সম্পর্কে বলছেন, কবিরা অসম্ভবের আকাঙ্ক্ষা করেন কেন? কারণ, এইটিই হচ্ছে কবিতার প্রধান বৃত্তি—যার মূল উৎস জাদুক্রিয়া। ক্ষুধার্ত, আতঙ্কগ্রস্ত অসভ্যেরা যেমন উদ্দাম নৃত্যের দ্বারা রূঢ় ও নির্মম বাস্তবকে মায়াজালে

৪। ছাদ পেটা বা ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে এই রীতি অবলম্বিত হয়:

আরও জোরে—হেঁইও!
সাবাস জোয়ান—হেঁইও!
একটু আরও—হেঁইও!

আচ্ছন্ন করে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেত সেই রকম কিটসও আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়ে স্থৈর্য ও অমরত্ব কামনা করছেন :

Still, still to hear her tender-taken breath,
And so live ever—

কিন্তু তা হবার নয়। প্রেম আসবে মৃত্যুর পথ দিয়ে :

And so live ever, or else swoon to death.

তাঁর যেন স্বপ্নভঙ্গ হল, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে তিনি পীড়াদায়ক অ নুভূতি থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। তাঁর মন এখন প্রশান্ত। বাহ্যত বহির্জগতের কোনো পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু তাঁর আত্মগত ভাব বদলে গেছে, সুতরাং তাঁর কাছে পৃথিবী ঠিক অপরিবর্তিত নয়। 'That is the dialectics of poetry, as of magic.'

ভাষা যখন এই দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করে তৃতীয় ও শেষ স্তরে এসে পৌঁছয় তখন আবেগেব স্থান অধিকার করে সাধারণ প্রত্যয় বা বিমূর্ত ভাব। এ ভাষা যুক্তিপ্রধান, প্রায়োগিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার উপযোগী। যে ভাবে আমরা ভাষার স্তববিভাগ করেছি তাতে মনে হতে পারে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের (প্রথমটি এখানে ধর্তব্য নয়) মাঝখানে এমন একটা বিস্তৃত ব্যবধান রয়েছে যা কোনো অবস্থাতেই অপনীত হতে পারে না। অর্থাৎ কবিতার যেন একটা নিজস্ব শব্দভাণ্ডার আছে যার দ্বারে ধর্না দেওয়া ছাড়া কবির গত্যন্তর নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবির শব্দচয়নের স্বাধীনতা প্রতিহত হয় একমাত্র তাঁর ভাবের দ্বারা। তিনি যে কোনো শব্দ গ্রহণ করতে পারেন। তবে শব্দটি তাঁকে প্রয়োগ করতে হয় তাঁর হৃদয়াবেগের আধানরূপে। যা সাধারণের সামগ্রী তিনি যেন তা-ই আত্মসাৎ করে তার উপর একটি বিশেষ ব্যক্তিগত অর্থ আরোপ করেন।

জাদু ও আদিম কবিতার সাযুজ্য সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি সেটা যে একেবারে অবিশ্বাস্য নয় তার অন্তত একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে। গ্রীক নাটক মঞ্চস্থ হত মদ্যদেবতা ডায়নিসাসের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য, অর্থাৎ ঐ নাট্যানুষ্ঠান ধর্মকৃত্যের

একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল।[৫] আদিম জাদুক্রিয়াও আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদিত হত, অতএব জাদু ও ধর্মকৃত্যের মধ্যে কবিতার উৎসসন্ধানের প্রয়াস হাস্যকর বিড়ম্বনায় নাও পর্যবসিত হতে পারে। অন্তত যতদিন না কোনো অভ্রান্ত, বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন বাধ্য হয়ে এইরূপ প্রকল্পই (hypothesis) আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি সমাজের ঠিক কোন অবস্থায় তা আত্মপ্রকাশ করেছে সে বিষয়ে জোর করে কিছু না বলাই ভালো। নৃত্যগীত ও বাদ্য সহযোগে যে ধ্বনিময় বাক্য সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হত তাকে আর যাই বলা যাক কবিতা বলা চলে না। কবিতা সমষ্টির সামগ্রী হতে পারে কিন্তু তার সৃজনক্ষেত্র ব্যক্তিমানস। এই কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, কবি তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করতে পারেন একান্তে, তাঁর নিভৃত মানসলোকে। সামাজিক বিবর্তনের ফলে কোনো কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তির ভাগ্যে যখন এই সুযোগ জুটেছে তখনই সত্যকার কাব্যরচনা সম্ভবপর হয়েছে। এঁকেই আদিকবি আখ্যা দেওয়া উচিত। ইনি সমাজনিষ্ঠ আবার সেই সঙ্গে আত্মনিষ্ঠ। ব্যক্তিগত অনুভূতি এখনও অব্যক্ত, সমষ্টিগত আবেগ প্রকাশই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে ক্রিস্টফার কডওএল বলছেন: These emotions, generated collectively, persist in solitude so that one man, alone, singing a song, still feels the emotion stirred by collective images. He is already exhibiting that paradox of art—man withdrawing from his fellows into the world of art, only to enter more closely into communion with humanity.'[৬] ব্যষ্টি এখনও আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে নি, মনোরাজ্যে সমষ্টিই সর্বাত্মক শক্তির অধিকারী। তবে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি—কবিতার সঙ্গে সংগীতের নিবিড় সংযোগ ('one man, alone,

৫। পরে আমরা আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করব।

৬। 'ইলিউশন ও রিয়্যালিটি'।

singing a song')। নৃত্য ও অনুকৃতিমূলক অভিনয় থেকে কবিতা এখন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু গানের সঙ্গে এর যোগসূত্র আজও যে একেবারে ছিন্ন হয় নি অন্যত্র আমরা তার প্রমাণ দিয়েছি।

জাদু ও ধর্মকৃত্য ছাড়া আদিম চেতনার আর একটি অভিব্যক্তি হল অতিকথা (myth)। ধর্মকৃত্য ও অতিকথা দুয়েরই মূলে আধ্যাত্মিক প্রেরণা, যা করণীয় তা-ই 'কৃত্য' আর যা বচনীয় তা-ই 'কথা'। ইংরেজী 'মিথ' শব্দটি 'লোগোস' (logos)-এর সগোত্র, দুয়েরই অর্থ 'যা কথিত হয়েছে'। পরে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিকৃতি ঘটে এবং মিথ বলতে বোঝায় অলীক কল্পনা। লোগোসের অর্থ অবশ্য অবিকৃত থাকে এবং তার ফলে শব্দ দুটি হয়ে দাঁড়ায় বিপরীতার্থক। বর্তমানে মিথের আভিধানিক অর্থ 'অতিপ্রাকৃত-ঘটনা-সংবলিত কাল্পনিক কাহিনী'। কিন্তু যে ভাবে মিথের উৎপত্তি হয়েছিল এবং কবিতার সঙ্গে এর যা সম্পর্ক—সে দিকে আমরা যদি একটু লক্ষ্য রাখি তা হলেই ঐ অর্থের অযৌক্তিকতা ও অবাস্তবতা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারব। আমাদের বেদকে বলা হয় শব্দব্রহ্ম, এবং প্রায় দু হাজার বছর পরে আর্যঋষিকল্পিত এই শব্দরূপী ব্রহ্ম খ্রীষ্টীয় 'লোগোস'রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন : 'In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him........In him was life ; and the life was the light of men. And the light shineth in darkness ; and the darkness comprehended it not.' লোগোস এখানে মিথের রূপ নিয়েছে। বস্তুত অতিকথা আধিবিদ্যক (metaphysical) প্রত্যয়বিশেষের বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি। এর উৎপত্তি বিশ্বসত্তার অব্যবহিত স্বজ্ঞায়, এবং এর উদ্দেশ্য উপলব্ধ সত্যের উদ্ঘাটন। ইয়ুংএর মতে অতিকথা আদিম মানসের উদ্ভাবন নয়, উপলব্ধি : সমস্ত সুপ্রচলিত অতিকথা 'প্রাক-চেতন আন্তরসত্তার

মৌলিক প্রকাশ ও নির্জ্ঞাত অন্তর্গূঢ় ঘটনাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত বিবরণ, এবং এগুলি কোনো মতেই নৈসর্গিক ক্রিয়ার রূপক নয়'।

অতিকথা কেন রূপক নয় সেটি বুঝতে গেলে আদিম মনের গতি-প্রকৃতির দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যখন নিঃসহায় মানুষের মনে ভয়ার্ত বিস্ময় জাগাত তখন সে রূপকচ্ছলে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিত—সাধারণত আমরা এইরকম ধারণারই বশবর্তী হয়ে পড়ি এবং রাহু ও বাসুকি উপাখ্যানকে বলি চন্দ্রগ্রহণ ও ভূমিকম্পের রূপক। কিন্তু রূপক মূলত একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার যুক্ত্যাভাস (rationalization) এবং এরূপ প্রক্রিয়া বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক বিকাশ না হলে সম্ভব হয় না। যারা অতিকথার প্রথম স্রষ্টা তাদের বুদ্ধি ছিল স্বল্প ও সীমাবদ্ধ, অতএব তারা যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছে (কিন্তু লিপিবদ্ধ করতে পারে নি) তার মধ্যে আমরা যদি রূপক ব্যাখ্যা খুঁজে বার করি তাহলে সেইটিই হবে বর্তমান আভিধানিক অর্থে 'মিথ'। যথার্থত ঐ অভিজ্ঞা অভিজ্ঞাতার সমগ্র জীবনবেদ, অতিকথায় তার অন্তরাত্মা ও সমষ্টিমন প্রতিবিম্বিত হয়েছে। জীবনের কঠোর বাস্তব থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সে অতিকথার সৃষ্টি করে নি বরং বাস্তব সত্যগুলিকে গ্রহণ করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সার্থক চেষ্টা করেছে।

এই সামঞ্জস্যবিধান—বহুবিধ অভিজ্ঞতার একত্র গ্রন্থন—কবির ধর্ম, এবং এই হিসাবে অতিকথা কবিতার সমকক্ষ। আদিম মানুষের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতি বা বহির্বস্তুর সম্পর্ক 'আমি-তুমি'র সম্পর্ক। অচেতন পদার্থে সে চেতনা অধ্যাসিত করত না, প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করত। প্রেরণালাভের মাহেন্দ্রক্ষণে আধুনিক কবিও প্রকৃতির হৃৎস্পন্দন উপলব্ধি করতে পারেন এবং তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয় 'মিথিয়পিক', অতিকথার ভাবে তিনি ভাবিত হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন :

> হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
> একমাত্র কন্যা তব কোলে।

অথবা ব্লেকের কল্পনাদৃষ্টি যখন সূর্যমুখী ফুলের উপর নিবদ্ধ হয় :

Ah, Sun-flower ! Weary of time,
Who countest the steps of the Sun ;
Seeking after the sweet golden clime,
Where the traveller's journey is done.

তখন আমরা পাই অতিকথার আধুনিক (কিন্তু মোটামুটি অবিকৃত) সংস্করণ। অতীত দিনের কঠোর জীবনসংগ্রামের কথা চিন্তা করলে অতিকথাকে মনে হয় একটি অত্যদ্ভুত কূটাভাস (paradox) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরই মাধ্যমে আমাদের আদিপুরুষ মনোজগৎ ও বহির্জগৎ একত্রবদ্ধ করতে পেরেছিল।

অতিকথা ও আদি প্রতীকের[৭] মধ্যে বিশেষ কোনো তারতম্য নেই, সর্বপ্রকার মানবীয় অভিজ্ঞতার চরম একত্বের প্রমাণ মানুষের এই দুটি পরমাশ্চর্য সৃষ্টি,—প্রত্যেকটি বিখ্যাত অতিকথা যেন মানুষের—অন্তত আর্য মানবের—বিচিত্র চিন্তাধারার মহাসংগম। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।[৮] সুপর্ণ (গরুড়) ও নাগের উপাখ্যান একাধারে প্রতীক ও অতিকথা। এর উপজীব্য নভশ্চর বিষ্ণুবাহন গরুড় ও পাতালবাসী নাগের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এই প্রাণী দুটি চালিত হচ্ছে শাস্ত্রোক্ত পুরুষ ও প্রকৃতি অথবা দ্যুলোকের পিতা ও আদ্যাশক্তি ধরিত্রীমাতার অঙ্গুলিসংকেতে। গরুড় আন্তরীক্ষ বস্তুনিচয়ের অধিনিয়ন্তা ও প্রখর সূর্যালোকের প্রতীক, আর পার্থিব জলপ্রবাহ ভূমিকে যে উর্বরতা দান করে নাগ তারই প্রতিকল্প। কাহিনীটি কিন্তু রূপক কল্পনার প্রকাশ নয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের সন্নিহিত ভূভাগের সর্বপ্রধান সত্য—অর্থাৎ অগ্নিতুল্য মধ্যাহ্নসূর্য ও স্নিগ্ধ বারিধারা—আদিম মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে তারই বাস্তব চিত্র ঐ অতিকথাটি। অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় গরুড় জাগতিক বন্ধন অস্বীকার করে অসীম মুক্তিপথের অভিযাত্রী আর সাপের যেন জীবনতৃষ্ণার

৭। চতুর্থ অধ্যায় : রূপকল্পনা দ্রষ্টব্য।

৮। Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia* (Bollingen Series, 39)

অবধি নেই, বাইরের খোলস ছেড়ে সে নিজেকে বহুবার পুনর্জীবিত করছে। মধ্যপ্রাচ্য,[৯] গ্রীস প্রভৃতি অঞ্চলে এই একই অতিকথা অন্য ভাবে কল্পিত হয়েছে। 'ইলিয়ড'এ দেখানো হয়েছে, ট্রয়যুদ্ধের প্রারম্ভে একটি ঈগল পক্ষী গ্রীক যোদ্ধাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে—তার নখর দিয়ে সে একটি রক্তাক্ত সাপকে ধরে রেখেছে। ঈগলের আবির্ভাব একটি মঙ্গলচিহ্ন, এর তাৎপর্য এই যে গ্রীকদের অধিদেবতা জিউস প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অ্যাফ্রোদিতেকে (যাঁর সহায়তায় প্যারিস হেলেনকে হরণ করেছে) পরাজিত করে দৈব বিধানকে জয়যুক্ত করবেন।[১০]

কবিতার জন্মকথা সম্বন্ধে উপরে যা বলা হল তা মোটের উপর অনুমানসিদ্ধ, প্রমাণসিদ্ধ নয়। বৈদিক যুগে এসে আমরা সর্বপ্রথম মানুষের কাব্যপ্রয়াসের সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই এবং সেই হিসাবে বলতে পারি প্রাক্কালীন যুগে শুধু কবিতার মুখবন্ধ (যা আমাদের কাছে অজ্ঞাত) এবং বৈদিক যুগে এর প্রথম অধ্যায় রচিত হয়েছিল। আগে যা নীহারিকাবৎ অস্পষ্ট ছিল এখন যেন তাই জ্যোতিষ্কের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

চতুর্বেদে এবং তৎপরবর্তী রচনায় আমরা দেখি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আদিম ভাবগুলি সুসংস্থিত হয়েছে। বেদের অন্তর্গত প্রতীকের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং এখানে অতিকথাকে এর বিকল্প বললে কদর্থ করার অপরাধ হবে না। বেদরচয়িতা যে গুণে আমাদের চিত্ত জয় করেন সেটি হচ্ছে তাঁর স্বাভাবিক কবিজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ এবং মানুষ ও প্রকৃতির ঐকাত্ম্যে সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু লৌকিক

৯। সুমেরিয়ান ও পারসীক চিত্রকলায় সাপ ও গরুড়সদৃশ একটি প্রাণী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

১০। হোমার এইজাতীয় অতিকথার স্রষ্টা নন, প্রাচীনতর ঐতিহ্যের তিনি উত্তরসাধক মাত্র। কিন্তু এতে তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, এবং সেইজন্যই অতিকথার প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি এক নূতন রূপ দিতে পেরেছিলেন।

জগতের প্রতি তিনি উদাসীন নন, এমন কি জাদুশক্তিতেও তাঁর অবিচলিত আস্থা রয়েছে।

বেদবর্ণিত ক্রিয়াকাণ্ডের সাহিত্যিক মূল্য অত্যন্ত নগণ্য কিন্তু এতে তৎকালীন সমাজের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বৈদিক সমাজ অপেক্ষাকৃত ব্যবস্থিত, কিন্তু বেদপূর্ব অবিভক্ত সাম্যসমাজের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত নয়। কৃষি ও পশুপালন এখন জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় এবং বেদের আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় আঠারো শতক পর্যন্ত এই প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রাপ্রণালীর কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। প্রাচীন তপোবন কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জনপদের সংখ্যা বেড়েছে, হিমালয়গিরিবর্ত্ম উল্লঙ্ঘন করে বহু বিদেশী জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, সমাজের ঊর্ধ্বস্তরে অনেক ওলটপালট হয়েছে, কিন্তু এই দীর্ঘকাল জনসাধারণ সমস্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের সংক্রমণ এড়িয়ে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেই জীবনাতিপাত করেছে।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে (ভারতীয় কাব্যের দ্বিতীয় যুগ) দেখি সীতা আবির্ভূত হয়েছেন হলরেখা থেকে এবং বলরাম হলায়ুধ, অর্থাৎ এখনও ভূকর্ষণবৃত্তিরই প্রাধান্য। তবে কাব্যের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব বীরত্বের সুর শোনা যায়। দুটি মহাকাব্যই সমাজবিপ্লবের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১১] সে বিপ্লবের মূল কারণ আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষ। রাজন্যবর্গের কলহ সংঘর্ষের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করেছে, এবং সেই কারণে রামায়ণ-মহাভারতে যে যুদ্ধচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অত ব্যাপক। অধর্মের উচ্ছেদ ও ধর্মসংস্থাপন কাব্যগ্রন্থ দুটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও নৈতিকতা বা আধ্যাত্মিকতা লৌকিক ভাবকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। গ্রীক মহাকাব্য ও নাটকে লৌকিক ভাবের প্রভুত্ব আরও অধিক মাত্রায় অনুভূত হয়। ডায়োনিসাস নামেই নাট্যানুষ্ঠানের অধিষ্ঠাতা, এবং মানুষের যাঁরা ভাগ্যবিধাতা সেই দেবতাদের স্থান নির্ধারিত হয়েছে নেপথ্যে—নাটকের অভ্যন্তরে নয়। নাটকের এবং

১১। রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' ('ইতিহাস') দ্রষ্টব্য।

মহাকাব্যের পুরোভাগে আছে মানুষ—যে দেবদেবীর হাতের ক্রীড়নক মাত্র অথচ বীরত্বগুণে দেবপ্রতিম।

প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় মহাকাব্যের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়,[১২] তবে এর কারণ সম্ভবত অতিকথাশ্রিত মানবীয় চেতনার ঐক্য—দুই দেশের পারস্পরিক প্রভাব নয়। বৈলক্ষণ্যও অবশ্য কম নয়, এবং এটি আমরা দেখতে পাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের মধ্যে। রাম অবতার না হলেও 'নরচন্দ্রমাঃ', এবং 'সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ' তাঁকে আশ্রয় করেছেন। এই আদর্শ পুরুষের পাশে ক্রোধান্বিত অ্যাকিলিস অতিশয় নিষ্প্রভ। রাবণ সীতাকে হরণ করে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু হেলেনহরণের সময়ে প্যারিস দৈব সাহায্য লাভ করেছে।

গ্রীক মহাকাব্যের ঐতিহ্য মধ্যযুগ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ভার্জিল প্রমুখ লেখকদের রচনা 'ইলিয়ড-ওডিসি'রই অনুকরণ এবং অল্পবিস্তর কৃত্রিমতাদুষ্ট। হোমারের বাস্তববোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সহজ ভাবের সহজ প্রকাশই তার কাব্যাদর্শ। সেইজন্য তাঁর রচনাতে কখনও প্রসাদ-গুণের অভাব দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর অনুগামী ভক্তবৃন্দের ধারণা ভাবাতিশয্য ও অলংকারবাহুল্য মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ। 'ইলিয়ড'এ অ্যাকিলিসের ফলক বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং সেটি যে একটি যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রাঘাত রোধ করার একটি প্রকৃষ্ট উপায়, তা আমরা অনায়াসেই বুঝে নিতে পারি। কিন্তু 'ইনিড'এ ভার্জিল ইনিসের (মহাকাব্যের নায়ক) ফলকের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বস্তুটির যুদ্ধোপযোগিতা সম্পর্কেই আমরা সন্দিহান হয়ে পড়ি। এই ধরনের ত্রুটি সত্ত্বেও 'ইনিড' অবশ্য রোমকদের জাতীয় মহাকাব্য। হোমার যেমন গৌরবময় অতীত জীবনের আলেখ্য অঙ্কন করে সমসাময়িক গ্রীকদের মনে জাতীয় গর্ববোধ জাগিয়ে দিয়েছিলেন ভার্জিল তেমনি ট্রোজান যোদ্ধা ইনিসকে রোমকদের আদিপুরুষ রূপে উপস্থাপিত করে এবং তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা দিয়ে তাদের কুলমর্যাদা

১২। সীতা ও হেলেন হরণ, কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব ও গ্রীক-ট্রোজানদের যুদ্ধ, রাম ও ইউলিসিসের ধনুর্ভঙ্গ ইত্যাদি।

ৃদ্ধি করেছিলেন। এ সাদৃশ্য কিন্তু বহিরাশ্রয়ী। ভার্জিলের অতিকথা ুদ্ধি- ও কল্পনা -প্রসূত। আর হোমার উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন জাতীয় বশ্বাস ও চেতনার দ্বারা (যেমন হয়েছিলেন বাল্মীকি ও বেদব্যাস)। সইজন্য 'ইলিয়ড' বা 'ওডিসি'তে যা সাবলীল ও স্বাভাবিক 'ইলিয়ড'এ া চেষ্টাকৃত ও কৃত্রিম। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম মহাকাব্যের যে পার্থক্য মামরা তৃতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি সেটি আসলে এই বিশ্বাস- ও চতনা -গত পার্থক্য।

মহাকাব্যেতর লাতিন কবিতাতেও গ্রীক ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে। হামার, সফোক্লিস, পিণ্ডার প্রমুখ প্রতিভাধর গ্রীক কবিরা যে সুউচ্চ শখরে আরোহণ করেছিলেন তারও ঊর্ধ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করার মতো ল্পনাশক্তি কোনো লেখকেরই ছিল না। সেইজন্য পূর্বসূরীদের পন্থা মনুকরণ করা ছাড়া রোমক কবিদের গত্যন্তর ছিল না। দু-একটি াব্যরূপ—যেমন স্যাটায়ার—তাঁরা অধিকতর পুষ্ট করেছিলেন কিন্তু মধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা গ্রীক রীতির ভাষ্যকার ও সম্প্রচারক। রামকদের মৌলিক প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে—আইন প্রণয়নে ও সভ্যতার ব্যবহারিক প্রয়োজনসাধনের উপায় উদ্ভাবনে। াদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বুদ্ধিগত এবং কাব্যের উপরও এই দ্ধিবৃত্তির প্রভাব পড়েছিল। লুক্রেসিয়াসের কবিতা এর দৃষ্টান্তস্থল। র্মসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি উগ্র সন্দেহবাদী এবং তথাকথিত র্বশক্তিমান দেবদেবীর কাল্পনিক প্রভুত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসই তাঁকে কবিকর্মে দীক্ষিত করে :

> O humankind unhappy !—when it ascribed
> Unto divinities such awsome deeds,
> And coupled thereto rigours of fierce wrath !
> What groans did men on that sad day beget
> Even for ourselves, and oh what wounds for us,
> What tears for our children's children !

(*Of the Nature of Things :* Book IV)

ই উদ্ধৃতি শুধু সন্দেহবাদের নিদর্শন নয়, নৈরাশ্যবাদেরও। তবে ক্রেসিয়াস ঠিক 'না-ধর্মী'দের দলভুক্ত নন। তাঁর বিশ্বাস, নৈসর্গিক

ঘটনাসমূহের পিছনে একটা যৌক্তিক বিধান রয়েছে, এবং সেইটি জানতে পারলেই সমস্ত দুঃখের অবসান হবে। 'অব দ্য নেচার অব থিংস'এ তিনি এই বিশ্বাসই প্রকাশ করেছেন। লুক্রেসিয়াসের বিশ্বকল্পনা বিজ্ঞানঅনুমোদিত নয়—এবং ঐ যুগে তা সম্ভবও ছিল না —কিন্তু প্রকৃতির রহস্য সমাধানের জন্য তিনি যে পথ অবলম্বন করেছিলেন সেটা যুক্তিরই পথ। অপরাপর লাতিন কবিও লুক্রেসিয়াসের মতো যৌক্তিকতাকেই কবিতার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। সেটা মূলত হয়তো মৌলিক প্রতিভার অভাবহেতু, তবে কতকটা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রীক ও লাতিন কাব্যের সাদৃশ্য প্রধানত রূপকলার দিক দিয়ে, ভাবের দিক দিয়ে নয়। গ্রীক কবিতার তুলনায় লাতিন কবিতা সেইজন্য দীপ্তিহীন ও নিরুত্তাপ। কিন্তু ইউরোপীয় কাব্যজগতে এর আভিজাত্য সর্বসম্মতি লাভ করেছে। পরবর্তী কালে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্য এর দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছে, এবং রেনেসাঁস যুগে যে ভাবের প্লাবন আসে তারও অন্যতম উৎস এই লাতিন সাহিত্য।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে রোমক সাম্রাজ্যের পতন ও মধ্যযুগের সূচনা হয়। মধ্যযুগের অপর একটি নাম অন্ধকার যুগ এবং এই নামকরণ যে অনুচিত নয় তা বুঝতে পারা যায় সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় লক্ষ্য করলে। ঐ নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে শুধু কয়েকটি অত্যুজ্জ্বল আলোকশিখা চোখে পড়ে—দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', জার্মান মহাকাব্য *Nibelungenlied* ও চসারের 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস'। এদের পরেই বিশেষভাবে উল্লেখ্য ফরাসী ত্র্যুবেদুর কবিতাবলী। কবিতাগুলি উৎসৃষ্ট হয়েছে নারীবন্দনায়, এবং যে আদর্শ রোমাণ্টিক প্রেমের সুর এখানে ঝংকৃত হয়েছে তা পুরাকালীন বা সমকালীন কোনো কবিতায় শোনা যায় না। মধ্যযুগে আরও অনেক রকম কবিতা রচিত হয়েছে, যথা রোমান্স, রূপক ও পশুকাহিনী,[১৩] তবে

১৩। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'রেনার্ড দ্য ফক্স'—যা প্রায় মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই জাতীয় কাহিনী পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পের সহিত তুলনীয়।

কাব্যকৌলীন্যবিচারে এই সমস্ত রচনাকে আমরা অন্ত্যজশ্রেণীভুক্ত করতে পারি—অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে।

মধ্যযুগীয় কাব্যের এহেন দৈন্যের কারণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। এখন সমাজ-আদর্শ বলতে বোঝায় গির্জা, রাজশক্তি ও শিভ্যালরির প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য—যার অর্থ এক কথায় স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিসর্জন। অবস্থাচক্রে যখন এইরকম দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয় তখন ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানুষের সৃজনক্রিয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মধ্যযুগেও এই বিপত্তি ঘটেছে, তবে শিভ্যালরির সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে রোমান্স রচনার প্রেরণা আসে নাইটদের বীরত্ব-আদর্শ থেকে, এবং অন্তত দুটি রোমান্স কাব্য হিসাবে গণনীয়—বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ফরাসী গ্রন্থ *Chanson de Roland* ও ওএলস-এর আর্থারীয় কাহিনী। এই দুটি কাহিনীর বিষয়বস্তু যুদ্ধ, প্রেম ও খ্রীষ্টীয় ধর্মাদর্শ। ফরাসী কাব্য এই সময়ে অন্য কাব্যের তুলনায় সমৃদ্ধ এবং নরম্যান যুগ থেকে চসারের যুগ পর্যন্ত ইংরেজী কাব্যে এর বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

মধ্যযুগে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় যাজক সম্প্রদায়ের হাতে। রোমক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পরে ইউরোপে যে বর্বরতা ও পৌত্তলিকতার ঢেউ এসে পড়ে গির্জাই তা রোধ করার চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টার ফলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন লাতিন সংস্কৃতির সংরক্ষণকেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু কালক্রমে লাতিন ভাষা অপভ্রষ্ট হয়[১৪] এবং মোটের উপর গির্জার প্রভাব মানবিকতা ও ললিতকলার আনুকূল্য সাধন করে নি। চিত্রশিল্পীদেব প্রায় বন্দিদশা—আধ্যাত্মিকতার বাইরে তাঁদের পদক্ষেপ করার স্বাধীনতা নেই, নারীসৌন্দর্য তাঁরা ফুটিয়ে তোলেন ম্যাডোনার মুখে, প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করেন মুখ্যচিত্রের পশ্চাৎপট হিসাবে। নারীকে নারীরূপে অথবা প্রকৃতিকে প্রকৃতিরূপে কল্পনা করা ধর্মত নিষিদ্ধ। কবিদের দুর্গতিও বড় কম নয়। শুধু মানবীয় অনুভূতি

১৪। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে এই ভাষাকে বলা হয় 'monkish Latin.'

প্রকাশ করলে তাঁদের রচনা জাতে উঠবে না, তার সঙ্গে একটু ধর্মভাব মেশানো চাই। লোকোত্তর প্রতিভা থাকলে অবশ্য ধর্মভাবকে কবিতার মূল ভাবে রূপান্তরিত করা যায় এবং তার প্রমাণ দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'।[১৫]

রামায়ণ-মহাভারতোত্তর সংস্কৃত কাব্য ভিন্ন পথ ধরে চলতে থাকে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থাও সামন্ততান্ত্রিক, কিন্তু সমাজের ঊর্ধ্বতন সম্প্রদায়ের চাপে কৃষিজীবী জনসাধারণকে কোনো সময়েই নাভিশ্বাসের অবস্থায় পড়তে হয় নি। এই যুগের সংস্কৃত কাব্য সাধারণত দরবারী কাব্য নামে অভিহিত হয়, কারণ অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে কোনো সাহিত্যানুরাগী রাজা অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এদের আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল অল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত রসিক পাঠকের মধ্যে। সংস্কৃত তখন কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হত না এবং সেইজন্য কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ লোকের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এইরূপ সম্পর্করাহিত্যের অনিবার্য ফল কৃত্রিমতা, এবং অশ্বঘোষ, কালিদাস প্রমুখ কয়েকজন লেখকের রচনা বাদ দিলে প্রায় সর্বত্র আমরা ঐ দোষ দেখতে পাই।

কাব্য রচনার প্রচলিত রীতিও স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশের ঠিক অনুকূল নয়। অলংকারশাস্ত্রোক্ত রসের অনুশীলনেই লেখকবৃন্দ সর্বক্ষণ ব্যস্ত এবং প্রত্যেকটি শ্লোক যাতে রসাশ্রিত হয় সে দিকে তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। প্রধান-অপ্রধান সব রসকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং রসাত্মক শ্লোকগুলি যেন পরস্পরের সহিত অসংশ্লিষ্ট হয়েই কবিতার মধ্যে স্থান পায়। শ্লোকগুলি অনেক সময়ে সুরচিত ও যথেষ্ট উপভোগ্য, কিন্তু সমগ্রভাবে রচনাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। কাব্য-রচয়িতাদের আর একটি ত্রুটি—বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, সমধ্বনিবিশিষ্ট স্বরবর্ণ, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ইত্যাদির প্রতি অত্যধিক আসক্তি এবং এর কুফল ভাষার অস্বাচ্ছন্দ্য এবং ভাষা ও ভাবের অসামঞ্জস্য।

প্রাচীন ইউরোপীয় কবিতা ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পার্থক্য খুব

১৫। চতুর্থ অধ্যায় : রূপকল্পনা ও প্রতীকতা দ্রষ্টব্য

সহজেই নির্দেশ করা যায়। স্যাফো, পিণ্ডার, লুক্রেসিয়াস প্রভৃতি গ্রীক ও রোমক কবি আত্মগত ভাবাবেগের প্ররোচনাতেই লেখনী চালনা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃতে লেখকেরা সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক ও সংযত, এবং ভাবের সামান্যীকরণে তাদের পরম আনন্দ। তাঁরা যে জগতে বাস করেন তা প্রশান্তি ও স্থৈর্যের জগৎ। দুঃখকষ্টের সহিত তাঁরা অপরিচিত নন কিন্তু এই ভেবে তাঁরা সান্ত্বনা পান যে 'There prevails a rational order in the world which is the outcome not of blind chance but of the actions of man in previous births.'[১৬] যৌক্তিক বিশ্ববিধানে (লুক্রেসিয়াস এরই সন্ধান করেছিলেন) এই অবিচলিত বিশ্বাসের জন্য গ্রীক-কাব্য-সুলভ আবেগের উন্মাদনা সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায় না। আবার এখানে যা পাই—মিলন, বিরহ, প্রিয়জনবিয়োগব্যথা, পরজন্মে মিলন-প্রত্যাশা প্রভৃতি সাধারণ অনুভূতির সাবলীল প্রকাশ—গ্রীক বা রোমক কাব্যে তা সব সময় মেলে না। সংস্কৃত কবিদের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মানুষের সদ্‌গুণাবলীর—যথা বীরত্ব, একনিষ্ঠতা, মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা—এবং স্বাভাবিক হাস্যপ্রিয়তা। সর্বোপরি তাঁদের প্রকৃতিপ্রেম কিথের ভাষায় 'যথার্থ ও অন্তরঙ্গ'। প্রকৃতি ও মানুষের আত্মীয়তা তাঁদের কাছে বাস্তব সত্য, এবং এই সত্যের কাব্যোচিত প্রকাশ তাঁদের রচনাকে অনন্যতা দান করেছে। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন সেটি এখানে উদ্ধৃত হতে পারে: 'শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত।···শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের

১৬। এ. ভি. কিথ: 'এ হিস্ট্রি অব স্যানসক্রিট লিটারেচার': বিভাগ ১৬ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। এই কাব্যে স্বভাব ও ধর্মনিয়মের যেমন মিলন মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন।' ('প্রাচীন সাহিত্য': 'শকুন্তলা')।

স্থূল হিসাবে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের যুগ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এর সূচনা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে এবং সমাপ্তি জয়দেবের গীতগোবিন্দে। পাঁচ থেকে বারো শতক পর্যন্ত— এই আট শ বছর ইউরোপীয় কালবিভাগ অনুসারে মধ্যযুগ, কিন্তু মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যের যে কোনো মিল নেই তার একটা বড় প্রমাণ কালিদাসের আবির্ভাব। কালিদাস আবির্ভূত হন আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে—যখন রোমক সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন—এবং যে কাব্যঐতিহ্য তিনি নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করেন তার উত্তরসাধনা বহুদিন যাবৎ অব্যাহত থাকে। ইউরোপ ঐ সময়ে বর্বরতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্রায় দিগ্‌ভ্রান্ত। অতএব দুই কাব্যের সামান্য লক্ষণ আবিষ্করণের চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে।

পাশ্চাত্ত্য ও সংস্কৃত কাব্যের অবস্থান্তর ঘটে মধ্যযুগের অবসানে। সংস্কৃত কাব্যের তখন অন্তিম দশা আর ইউরোপীয় কবিতায় নূতন জীবনের স্পন্দন। এই যুগের প্রচলিত অভিধা রেনেসাঁস, 'নবজাগরণ' অথবা 'বিদ্যার নবজন্ম' (Revival of Learning)। নবজাগরণের কারণ নানাবিধ, যথা গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের পুনরাবিষ্কার, চার্চশক্তির অবক্ষয়, সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যহ্রাস ও বণিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়, বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ও ভাষার বিকাশ, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র, কামানের বারুদ ও দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগ, জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতি (টলেমীয় পদ্ধতির পরিবর্তে কোপারনিকাস পদ্ধতির অবলম্বন) এবং মহাসমুদ্রের পরপারে নূতন দেশের আবিষ্কার।[১৭] রেনেসাঁস একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এর আগে যে বহুদিন ধরে

১৭। রেনেসাঁসের আসল অর্থ চিরায়ত গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের আবিষ্কার, অন্য সব ঘটনার দ্বারা রেনেসাঁস ভাবধারা অধিকতর পুষ্ট হয়।

উদ্যোগপর্ব চলছিল তার প্রমাণ পাই পেত্রার্কের রচনায়। তাঁর ধর্মভাব, কৃচ্ছ্রসাধনপ্রবণতা ও পাপপুণ্যবোধের তীব্রতা মধ্যযুগীয় মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্তু প্রাচীনত্বপ্রীতি, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশরীতি অবলম্বনের প্রয়াসকে রেনেসাঁস চেতনার পূর্বসংকেত বলা যেতে পারে।

রেনেসাঁস চেতনার মর্মকথা হল স্বাধীনচিন্তা ও জীবনপ্রীতি। তপশ্চর্যা ও স্বর্গরাজ্যকল্পনায় কবিরা এখন আর সন্তুষ্ট নন, পার্থিব জগৎকে তাঁরা সম্ভোগ করতে চান এবং 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই সত্য উদ্ঘাটনেই তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। প্রসঙ্গত হ্যামলেটের একটি উক্তি স্মরণীয়: 'What a piece of work is a man! How noble in reason! how infinite in faculties! in form and moving, how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension, how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!' (*Hamlet*: II. 2.)

রেনেসাঁস আরম্ভ হয় ইতালিতে এবং পরে সেখান থেকে ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সে রেনেসাঁস ভাবধারার প্রথম বাহক Ronsard ও Joachim du Bellay-পরিচালিত একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ('Pleiade') এবং এর মূল মন্ত্র ছিল চিরায়ত সাহিত্য ও নব্য-প্লেটোবাদের অনুবর্তন এবং ফরাসী কাব্যে সনেট প্রভৃতি নূতন রূপকলার প্রবর্তন। স্পেনে রেনেসাঁসের প্রভাব পড়ে নাটক ও গদ্যসাহিত্যের (সারভাঁতের 'ডন কুইক্সট') উপর, কবিতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। ইংলণ্ডে নাটক ও কবিতা দুয়েরই চরম বিকাশ হয়, এবং তার হেতু রেনেসাঁস ভাবের প্রসার, নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা ও শেক্সপিয়রের মতো প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব। ড্রেকের ভূপরিক্রমণ, স্পেনীয় আর্মাডার পরাজয়, ইংলণ্ডের নৌবলবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে সর্বসাধারণের মনে যে গর্ববোধ জেগেছিল সেইটিই কাব্যরচনার উপযুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দ্য সেকেণ্ড'এর কয়েকটি ছত্র তৎকালীন জাতীয় মানসের দর্পণস্বরূপ :

This royal throne of kings, this sceptr'd isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi paradise,
... ...
This blessed plot, this earth, this realm,
This England. (II. 1)

এলিজাবেথীয় কবিতার ভাব, বিষয়, ছন্দ ও রূপকলা নানা সূত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। অবিমিশ্র রেনেসাঁস ভাব কদাচিৎ চোখে পড়ে, এবং সময়ে সময়ে উগ্র ইন্দ্রিয়লালসা, ঐহিকতা, পৌত্তলিকতা ও অখ্রীষ্টীয় মনোভাব কাব্যপ্রয়াসকে কলুষিত করেছে। মার্লোর রচনায় এই দোষ দেখা যায়, যদিও তিনি রেনেসাঁসের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর দু-তিনটি নাটকের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান, শক্তি অথবা জাগতিক সৌন্দর্যলাভের অসীম পিপাসা—যেমন ট্যামুরলেন চায় অনন্ত শক্তি এবং ফস্টাসের কাম্য অনন্ত জ্ঞান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ট্যামুরলেন পৌত্তলিকতার নগ্ন প্রতিকৃতি, আর ফস্টাসের নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়লালসার যেন শেষ নেই। মার্লোর কাহিনীমূলক কবিতা 'হিরো অ্যাণ্ড লিণ্ডার'ও এইরূপ দোষাশ্রিত রচনা, এমন কি শেক্সপিয়রের 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডনিস'ও এদিক দিয়ে ত্রুটিহীন নয়।

এডমাণ্ড স্পেনসার এলিজাবেথীয় সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর দৃষ্টি দুদিকে নিবদ্ধ—রেনেসাঁসের সীমাহীন স্বাধীনতা এবং মধ্যযুগীয় নৈতিকতা ও রোমান্স তথা রূপকপ্রবণতার দিকে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'ফেয়ারি কুইন' একাধারে রোমান্স ও রূপক এবং উচ্চবংশজাত ব্যক্তিদের নৈতিক উন্নতিবিধানকল্পে তিনি শিভালরি-আদর্শের সাধুবাদ করেছেন। তবে নৈতিকতার পেষণে কাব্যমাধুর্য বিনষ্ট হয় নি। 'ফেয়ারি কুইন' বিচিত্র-সুরসমন্বিত একটি অপূর্ব ঐকতানবিশেষ। এর বর্ণ-বৈচিত্র্য, দৃশ্যসমারোহ ও মধুবর্ষী শব্দসম্ভার স্পেনসারের সূক্ষ্ম কলাদক্ষতার অভিজ্ঞানস্বরূপ এবং এই দক্ষতার জন্য তিনি 'কবির কবি' আখ্যা লাভ করেছেন।

ঐ যুগের মহাসম্পদ সনেট ও গান। শেক্সপিয়রের সনেটগুলি বিশ্বসাহিত্য অলংকৃত করেছে, এবং তাঁর নাটকস্থ অনেক গান হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল। স্পেনসার, সিডনি, মার্লো, গ্রীন, লজ প্রভৃতি লেখক সনেট অথবা সংগীত রচনায় প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কোনো কোনো অজ্ঞাতনামা কবির গানও—যেমন 'দেয়ার ইজ এ লেডি সুইট অ্যাণ্ড কাইণ্ড'—ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। এই সব কবিতায় এবং এলিজাবেথীয় অন্য রচনারও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—যথা লিরিকধর্মিতা, হৃদয়াবেগের প্রাবল্য এবং অল্লাধিক উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাশক্তি। এগুলি রোমাণ্টিসিজমের লক্ষণ এবং ক্লাসিক রচনারীতির অনুসরণ ও সংযম ও শৃঙ্খলারক্ষা যদি রেনেসাঁস-আদর্শ হয় তা হলে বলতে হবে ইংরেজ কবিদের আদর্শচ্যুতি ঘটেছে। বস্তুত ইংরেজী কাব্য প্রাথমিক পর্বে ইতালীয় ও লাতিন সাহিত্যের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত রেনেসাঁস-ভাবকেন্দ্র থেকে দূরে সরে আসে এবং স্বাধীনভাবে, দেশজ রূপেই বিকাশ লাভ করে। শেক্সপিয়রের মতো লেখকেরা নিয়ম-অনিয়মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন নি কিন্তু ঐ স্বাধীনতার ফলে দুর্বল লেখকদের রচনা আতিশয্যদুষ্ট হয়ে পড়েছিল। ক্লাসিসিজমের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন কবি ও নাট্যকার বেন জনসন এবং তিনি প্রথম এই আতিশয্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

মিলটনকে রেনেসাঁসের শেষ অধিবক্তা বলা যায়, তবে ইতিমধ্যে কবিতার ধারা বদলে গেছে। এই নূতন ধারার প্রবর্তক ডন ও তাঁর অনুগামীরা—ডক্টর জনসন পরে যাঁদের নাম দেন 'মেটাফিজিক্যাল কবিগোষ্ঠী'। সাধারণ অর্থে ডন বাস্তবিকই দার্শনিকভাবাপন্ন, মৃত্যু এবং দেহ ও আত্মার সম্পর্ক চিন্তনে তিনি সর্বদা নিমগ্ন। কিন্তু ডক্টর জনসনের কটাক্ষ ডনের অদ্ভুত ও অবাস্তব উপমা (conceit) প্রয়োগের দিকে। পূর্ববর্তী কাব্যেও উপমার বাড়াবাড়ি আছে। প্রণয়িনীর নয়নবহ্নিতে—সে বহ্নি প্রেমিকেরই প্রেমাগ্নি—প্রেমিকের পরিচ্ছদে আগুন লেগে গেছে—এরূপ উদ্ভট উপমারও উদাহরণ পাওয়া

যায়। কিন্তু এটা সাধারণ উপমারই (নয়নবহ্নি) অতিরঞ্জন, অপর পক্ষে, মেটাফিজিক্যাল উপমাতে কোনো রকম যুক্তিপরম্পরা রক্ষিত হয় না এবং যে দুটি বস্তু পরস্পরের সহিত তুলিত হয় তারা মোটেই অনুধর্মক (analogous) নয়। ডনের একটি কবিতায় বিরহক্লিষ্ট প্রেমিক প্রেমিকা উপমিত হয়েছে কম্পাসের বিচ্ছিন্ন কাঁটা দুটির সঙ্গে। এ রকম রীতি অবলম্বনের বিপদ অনেক। একটু অনবধানের ফলে ভাবের দিক থেকে গুরুচণ্ডালি দোষ ঘটতে পারে, এবং বাস্তবিকই তাই ঘটেছে ডনের অনুগামীদের রচনাতে, এমন কি তাঁর নিজেরও কয়েকটি কবিতায়। তবুও ডনের কৃতিত্ব এই যে কবিতাকে তিনি গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে দূরে সরিয়ে এনে তাকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রধান বিশেষত্ব হল ভাবের বুদ্ধিদীপ্ত 'বিশ্লেষণ', সুললিত 'প্রকাশ' নয় এবং এই হিসাবে তিনি সাম্প্রতিক লেখকদের অন্যতম পূর্বসূরী।

ফরাসী কবিরাও রোমান্টিক আতিশয্যকে একটু ভীতির চক্ষে দেখেন। বক্তব্যের যাথার্থ্য ও ভাষার স্বচ্ছতার দিকে তাঁদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তা ছাড়া ১৬২৯ সালে ফরাসী অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে কবিতা অনেকটা বিধিবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিধি-নিষেধ আতিশয্য নিরাকরণের সহায়ক হলেও সময়বিশেষে মনন ও কল্পনাশক্তিকে প্রতিরুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু ফরাসী কবিদের মানসিক গঠন একটু অন্যরকম। এবং সেইজন্য প্রাক-রোমান্টিক যুগ পর্যন্ত তাঁরা একে ঠিক প্রতিরোধ মনে করেন নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফরাসী কবিতার অগ্রগতি এতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সমকালীন ভারতীয় কবিতা ইংরেজী কবিতার তুলনায় অনেক দুর্বল কিন্তু অবজ্ঞার যোগ্য নয়। সংস্কৃত কাব্যের প্রাণশক্তি আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, এখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ করে মোগল দরবারে, হিন্দী ও ফরাসী ভাষারই প্রতিপত্তি। হিন্দী কবিতার প্রাথমিক বিকাশ হয় ভক্তিবাদের মধ্য দিয়ে এবং মীরাবাই, কবীর প্রভৃতি যে ভাবের স্রোত আনেন ষোলো শতকে তুলসীদাস

সেই স্রোতকে আরও বেগবান করে তোলেন। তাঁর 'রামচরিত-মানস'কে স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন বলেছেন হিন্দুস্থানের 'লক্ষ লক্ষ লোকের একমাত্র বাইবেল।' ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে এই যুগ হিন্দুস্থানী সাহিত্যের 'অগাস্ট্যান এজ'। তুলসীদাস যেমন রামভক্তির উদ্গাতা তেমনি কৃষ্ণভক্তির জয়গান করেন অন্ধ কবি সুরদাস, নন্দদাস ও র‍্যাস খাঁ (বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠলদাসের মুসলমান শিষ্য)। সুরদাস 'সুরসাগর' নামক কাব্যগ্রন্থে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন, তাঁর অন্যান্য কবিতা কৃষ্ণরাধার প্রেমবিষয়ক। রাস খাঁর 'প্রেমবর্তিকা' ও নন্দদাসের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ে'ও বিখ্যাত রচনা। ষোলো ও সতেরো শতকের মারাঠী কবি একনাথ, তুকারাম ও রামদাসের রচনাতেও ভক্তিরসের প্রাধান্য। গুজরাটী লেখক অখো ও প্রেমানন্দের সুর একটু স্বতন্ত্র। প্রথমোক্তের ভঙ্গি বিদ্রূপাত্মক এবং দুষ্কৃতির উপর কশাঘাত করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। দ্বিতীয়োক্তের দৃষ্টি বিভিন্ন রসের দিকে এবং তাঁর রচনা এই সব রসেরই ছন্দোরূপ।

একটু আগে ফরাসী কবিতার যে বিধিবদ্ধতার কথা বলেছি তার পরিচয় পাওয়া যায় ইংরেজী অগস্টান বা নব্য-ক্লাসিক্যাল কবিতায় (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত) এবং আংশিকভাবে পূর্ববর্তী রেস্টোরেশন কাব্যে। এই যুগের কবিরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলেন এবং সেই সব নিয়ম তাঁরা চিরায়ত সাহিত্যে ও প্রাচীন সমালোচনাশাস্ত্রে আবিষ্কার করেন। আবিষ্কার সময়ে সময়ে উদ্ভাবনে পর্যবসিত হয়। যা প্রাচীন সাহিত্যে নেই ভুল করে তাই তাঁরা কাব্যসংহিতার অন্তর্ভুক্ত করেন। পোপের 'এসে অন ক্রিটিসিজম' থেকে এই নিয়মনিষ্ঠা ও ভুল ধারণার একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

> **Nature and Homer were, he[১৮] found the same.**
> **Convinc'd, amaz'd, he checks the bold design :**
> **And rules as strict his labour'd work confine**

১৮। লাতিন কবি ভার্জিল।

As if the Stagirite[19] o'erlooked each line.
Learn hence for ancient rules a just esteem :
To copy nature is to copy them.

বোয়াল্‌ প্রমুখ ফরাসী কবি ও সমালোচকদের অনুসরণে পোপ এখানে নব্য-ক্লাসিক তত্ত্বের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তবে বক্তব্যটা খুব স্পষ্ট হয় নি। 'নেচার' বলতে পোপ বোঝেন সুবুদ্ধি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বন্দিত বহিঃপ্রকৃতি নয়। কিন্তু কথাটির উল্লেখ এখানে বাহুল্য মনে হয়, কারণ হোমার ও নেচার যখন অভিন্ন তখন তাঁর কাব্যে নিয়মের সন্ধান পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সুবুদ্ধিরও উদয় হবে, অন্য ভাবে আর তার অনুশীলন করার দরকার হবে না। তত্ত্বটি যে ভাবেই ব্যাখ্যাত হোক এখানে আমরা প্রয়োগকর্তার অর্থাৎ নব্য-ক্লাসিক কবির একটি বিশেষত্ব দেখতে পাচ্ছি—প্রাচীন রীতিতে অন্ধ বিশ্বাস। কাব্যের মধ্যে আমরা আরও কয়েকটি লক্ষণ দেখতে পাই—যেমন বস্তুনিষ্ঠতা, কল্পনাবিমুখতা, সমাজচেতনা এবং ব্যঙ্গ- ও নীতি-প্রবণতা। মানুষের অস্তিত্ব তাঁর কাছে সামাজিক জীব হিসাবে, ব্যক্তিতা (individuality) ও আত্মগত ভাব সম্পর্কে হয় তিনি সচেতন নন, না হয় তিনি একে পরিহার করাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। উপদেষ্টা হিসাবে তিনি মাঝে মাঝে একটু আমিত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন কিন্তু তখনও তিনি সমাজসম্পর্কিত ব্যক্তিগত মতামত ছাড়া কোনো গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন না। করার হয়তো সাধ্যও নেই কারণ বুদ্ধিগত দৃষ্টি অন্তর্জগৎ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে না। ক্লাসিসিজমের এই দৌর্বল্য সত্ত্বেও যুক্তিপ্রধান রচনাতে এর কার্যকারিতা অবশ্য স্বীকার্য।

ক্লাসিসিজমের বিপরীত ভাব রোমান্টিসিজম, এবং একে কেন্দ্র করে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে একটা ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় আঠারো শতকের শেষ দিকে। এর পটভূমিতে আছে তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা—শিল্পবিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব।

১৯। অ্যারিস্টটল।

সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার যে আদর্শ বিপ্লবের সময়ে ঘোষিত হয়—কিন্তু যা বাস্তবে পরিণত হয় নি—তার প্রথম প্রচারক বিখ্যাত ফরাসী মনীষী রুসো। তাঁর 'সোস্যাল কনট্র্যাক্ট' ও 'এমিলি'র সূচনা যথাক্রমে এইরূপ: 'মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে স্বাধীন হয়ে কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলাবদ্ধ' ও 'ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিই অপাপবিদ্ধ;' মানুষের হস্তক্ষেপে তারা পাপে পরিণত হয়েছে।' মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মেছে—এ কথা বলার অর্থ রাজার তথাকথিত ঈশ্বরদত্ত অধিকারের মূলে আঘাত দেওয়া। আর ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিই নিষ্পাপ—এই উক্তির দ্বারা রুসো ভীতিজনক আদি-পাপতত্ত্বের খণ্ডন করেন। রুসো ও সমসাময়িক অন্যান্য ফরাসী লেখকের এইরূপ বৈপ্লবিক মন্তব্য নিপীড়িত জনসাধারণ সঞ্জীবনমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে এবং বহু শতাব্দী ধরে রাজশক্তি এবং যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয় সেটা যখন একটা বিস্ফোরকের মতো প্রচণ্ডভাবে জ্বলে ওঠে তখন ফ্রান্স ও সন্নিহিত অন্য দেশে এক নূতন আশার উদ্দীপন হয়:

Bliss was it in that dawn to be alive,
But to be young was very Heaven.
(Wordsworth : *Prelude*)

এই আশা অবশ্য পরে ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে এবং বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়—যেমন ওআর্ডসওআর্থ সমস্ত বৈপ্লবিক ভাব বর্জন করে অ্যালডাস হাক্সলির ভাষায় সরকারী চার্চপন্থী টোরিদের দলভুক্ত হন—তবে প্রথম পর্যায়ে ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান কবিতা যে ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা সবিশেষ প্রভাবান্বিত হয় সাহিত্যইতিহাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রোমান্টিসিজমের উৎপত্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে, এবং সেইজন্য রোমান্টিক কবি অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মনিমজ্জিত। সমাজবিমুখতা তাঁর স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য এবং হয় তিনি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন—যেমন করেছিলেন বায়রন—আর না হয় সমাজ থেকে দূরে সরে এসে তাঁর নিজস্ব জগৎ রচনা করেন। ওআর্ডসওআর্থ লেক

ডিস্ট্রিক্টের শান্ত পরিবেশে প্রকৃতিপূজায় নিমগ্ন,—এক সময়ে তিনি যে ফ্রান্সের ঘটনাবর্তের মধ্যে পড়েছিলেন সে কথা এখন ভুলে গেছেন—কিটস অম্লান সৌন্দর্যের অভিসারী, শেলি প্লেটোর আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্যের অম্বেষ্টা আর বায়রনের নায়ক—সমাজ-বিদ্রোহী, আত্মকেন্দ্রিক ও জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। রোমান্টিক কবির কাছে যুক্তির কোনো দাম নেই, হৃদয়াবেগকেই তিনি সব সময়ে প্রশ্রয় দেন এবং সত্যোপলব্ধির পথ যে আবেগের পথ এ বিষয়ে তিনি সংশয়হীন। এই আবেগাতিশয্য, পলায়নীবৃত্তি ও বাস্তববিমুখতা অবস্থাবিশেষে মনে হতে পারে এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা, কিন্তু বহির্বস্তু ও অন্তরাত্মার ঐকাত্ম্যবোধ, 'আমি-তুমি'র বিভেদলোপ—যা অতিকথা সৃজনের আদিকারণ—রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া সম্ভব হয় না। নব্য-ক্লাসিক কবি বাইরের কোনো বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে পারেন না, তাঁর বস্তুবোধ কোনো অবস্থাতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে না এবং সেইজন্য তিনি তাঁর মানবিক স্বাতন্ত্র্য সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। বিষয় যখন অগভীর তখন এই মনোবৃত্তিই কার্যকরী হয়, কিন্তু রোমান্টিক কবি চান আরও গভীরে যেতে—to 'see into the life of things'—এবং সেইজন্য তিনি কামনা করেন ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে তাঁর আত্মবিলোপ ঘটুক। এটা যখন সত্যই ঘটে তখনই তিনি অতিকথার সৃষ্টি করেন।

বিষয়নির্বাচনে রোমান্টিক কবি অনন্যতন্ত্র। মনের গহনে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই তিনি যেন আত্মস্থ বোধ করেন, এবং সেই কারণে আমরা দেখতে পাই রোমান্টিক কবিতার মূল ভাব হিসাবে গৃহীত হয়েছে ক্ষণস্থায়ী পলায়মান অনুভূতি, স্বপ্ন, স্মৃতি, অবচেতন মন, মৃত্যু ও অতিপ্রাকৃতের রহস্য, অন্ধকার রাত্রি এবং সমাধিস্থানের নিস্তব্ধতা ও ভয়াবহতা। এরূপ ভাব যখন কবির অন্তস্তল থেকে স্বতঃই উৎসারিত হয় তখন আমরা পাই কোলরিজের 'কুবলা খাঁ' বা ওআর্ডসওআর্থের 'এ স্লাম্বার ডিড মাই স্পিরিট সিল'এর মতো কবিতা। আর তা যদি না হয় তাহলে বিষয়টির উপর ব্যাধিত মনের ছায়া পড়ে

—যেমন পড়েছে শেলি-কিটস-বায়রনের একাধিক কবিতায়। অন্য অনেক বিষয়ও রোমান্টিক কবিকে আকৃষ্ট করে, যথা রুদ্র অথবা শান্ত প্রকৃতি এবং মধ্যযুগীয় ও (সাধারণত) প্রাচীন ক্লাসিক ঐতিহ্যের সহিত অসম্পর্কিত ঘটনাসমূহ। সাধারণ বিষয়ও অগ্রহণীয় নয়, তবে তার উপর ওআর্ডসওআর্থবর্ণিত সেই কল্পনার আলোকপাত হওয়া চাই।

The light that never was on sea or land
The consecration and the poet's dream.

রোমান্টিক রচনারীতি সম্পূর্ণরূপে বিষয়নির্ভর (বিষয় ও রীতির সংগতি অবশ্য রোমান্টিক অ-রোমান্টিক সব কবিতারই বিশেষত্ব), এবং বিষয়বস্তুর যে বৈচিত্র্য আমরা দেখেছি রীতিতেও তা বর্তমান। বিষয়ের মতো রীতিও লেখকের স্বকপোলকল্পিত, তবে প্রচলিত ছন্দ-প্রকরণের বিরোধী নয়। তিনি যে বিষয়কে রূপ দেন তার প্রয়োজন অনুসারেই ছন্দ নির্বাচন করেন।[২০] অপরাপর কবিতাও এই একই পদ্ধতির অনুবর্তী, কিন্তু রোমান্টিক কাব্যে আমরা দেখতে পাই বিষয়-নির্বাচনে লেখক একান্ত আত্মবশ বলে প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি বাধ্য হয়ে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করেন। তাঁর প্রকাশরীতি ভাবের দ্বারা একটু বেশিরকম নিয়ন্ত্রিত এবং গঠনসৌষ্ঠবের প্রতি তিনি এত উদাসীন যে অহেতুকভাবে বিষয়বস্তুকে পল্লবিত করতে তিনি ইতস্তত বোধ করেন না। ইংবেজী রোমান্টিক কবিতায় দেখি ভাষাপ্রয়োগে নব্য-ক্লাসিক কাব্যরীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু পূর্বতর ঐতিহ্য উপেক্ষিত হয় নি। 'হাইপিরিয়ন' রচনাকালে কিটস মিলটনীয় এপিক রীতি অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি কারণে তিনি কবিতাটি সমাপ্ত করতে পারেন নি—তাঁর স্বাভাবিক লিরিকপ্রবণতা ও মিলটনের ইংরেজী-ঐতিহ্যবিরোধী শব্দবিন্যাসের জন্য। বর্তমান প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কারণটি লক্ষণীয়। রোমান্টিক ঐতিহ্যহীনতার নিন্দাবাদ

২০। পোপের যুগে হেরোয়িক কাপলেটের (বাঙলা পয়ারের অনুরূপ) একাধিপত্য, কিন্তু রোমান্টিক কবিতার ছন্দ নানাপ্রকার।

প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু আমাদের মনে হয় ব্যাপারটা আপেক্ষিক এবং মোটামুটি বিষয়নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ।

রোমান্টিসিজমের যে সব লক্ষণের কথা উপরে বলা হল তাদের প্রত্যেকটিই কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে দৃষ্ট হয় না। নব্য-ক্লাসিক কবিতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এবং একটা বিশেষ আন্দোলনের আকারে রোমান্টিক কবিতা আত্মপ্রকাশ করে বলেই ঐ অভিধাটি প্রয়োগ করা হয়। আসলে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি চিরন্তন। স্যাফোর প্রেমমূলক কবিতা, কালিদাসের মেঘদূত ও এলিজাবেথীয় সনেটে আমরা যে সুর শুনতে পাই সেটা রোমান্টিসিজমেরই সুর। আবার চঞ্চল হৃদয়াবেগ চাঞ্চল্য না হারিয়ে কি ভাবে ক্লাসিক রীতির আশ্রয় নেয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওআর্ডসওআর্থের 'লুসি' কবিতায়।

রোমান্টিক ধারা গতিশীল থাকে মোটামুটি হিসাবে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ইত্যাদি কারণে চিন্তারাজ্য অবশ্য কিছুটা পরিমাণে সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে কিন্তু কবিতায় চিত্তবিক্ষেপের প্রকাশ এখনও ঠিক রোমান্টিক-রীতিবিরুদ্ধ নয়। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ বাইবেলোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসকে বিচলিত করে তোলে কিন্তু তাতে রোমান্টিকভাবাপন্ন ইংরেজী কবিতার স্থিতিকেন্দ্র অবিচলিত থাকে। ব্রাউনিং তো ধরেই নিয়েছিলেন স্বর্গে যখন ভগবান আছেন তখন মর্ত্যজগৎও ঠিকমত চলতে থাকবে। টেনিসন একটু পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনিও 'ইন মেমোরিয়ম'এ কতকটা গোঁজামিল দিয়ে ব্যক্তিগত অমরতা প্রতিপাদিত করেছিলেন। আশাভঙ্গের সুর শুনিয়েছেন মাত্র একজন কবি—টমাস হার্ডি। বাস্তবকে অস্বীকার না করে তিনি দেখেছেন

Crass Causalty obstructs the sun and rain,
And dicing Time for gladness casts a moan.

উনিশ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সে যে প্রতীকী কাব্য [২১] লিখিত

২১। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হয় তাও রোমান্টিসিজমেরই একটি সূক্ষ্ম—এবং প্রায় বায়বীয়—রূপ। প্রতীকতার সঙ্গে মেশে আর একটি ভাব যার নাম দেওয়া হয়েছে অবক্ষয় (decadence) এবং এই অবক্ষয়কে নান্দনিক মর্যাদাদানের চেষ্টা করা হয়। অতীত জীবনের তুলনায় বর্তমান জীবন অত্যন্ত শ্রীহীন—এই চেতনাই হল অবক্ষয়চেতনা,—এবং অনেকের মতে—'আধুনিকতা'। আধুনিকতার তাহলে মানে দাঁড়াচ্ছে ক্ষয়িষ্ণুতাপ্রীতি কিংবা বিগত গৌরবের জন্য বিষণ্ণ ব্যাকুলতা। যাঁরা এর উদ্গাতা তাঁরা বস্তুজগৎ ও সমাজ থেকে নিজেদের বিবিক্ত করে অনিবার্যভাবে কলাকৈবল্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মার্কসবাদী সমালোচকদের মতে শিল্পীদের এই অধঃপতন মুমূর্ষু বুর্জোয়া শক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এবং এ যুক্তি আমরা যদি নাও স্বীকার করি তবুও এটুকু আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে—বুর্জোয়া সংস্কৃতির পরিণতি যাই হোক—রোমান্টিক কাব্যের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে।

আধুনিক কবিতার আবির্ভাব বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এবং প্রায় আক্ষরিক অর্থে একে একটা মহাবিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যন্ত্রশক্তির প্রসার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের ফলে মানুষের মনে যে বিপ্লব সংঘটিত হয় সাহিত্যে বিপ্লব তারই প্রতিরূপ। বিশেষ করে শেষোক্ত দুটি ঘটনা যুগচেতনাকে গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ করে এবং আধুনিক কবিরা তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ অ-রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বিক্ষুব্ধ চেতনারই স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। সহজ সিদ্ধিলাভের আশা এখন দুরাশা, কারণ ইতিমধ্যে মানস সত্যের প্রকৃতি আশ্চর্যরকম বদলে গেছে। মনঃসমীক্ষণ ও নৃতত্ত্ব ব্যষ্টি-ও সমষ্টি-মনের উপর নূতন আলোকপাত করে যে নির্জ্ঞাত মানসরাজ্য আবিষ্কার করেছে, কবিদের বিশ্বাস, সেখানে গিয়ে পৌঁছতে না পারলে তাঁরা সত্যের সন্ধান পাবেন না। স্টিফেন স্পেণ্ডার বলছেন,[২২] সত্য ঠিক হিমশৈলের মতো, তার যেটুকু অংশ আমরা জলের উপরে দেখতে পাই সেটা তার আটভাগের একভাগ মাত্র, বাকী সাত ভাগ

২২। 'দ্য ক্রিয়েটিভ এলিমেণ্ট'।

থাকে জলের নীচে, আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। সাধারণ দৃষ্টিতে মনুষ্যসত্তারও আমরা একটু ক্ষীণ আভাস মাত্র পাই, তার যা আসল সত্য সেটা থাকে নির্জ্ঞাত মনে—যা আমাদের কাছে রহস্যাবৃত। সত্যকে যদি অবিকলভাবে প্রকাশ করতে হয় তাহলে কবিকে যেতে হবে মনের দুর্গম স্থানে এবং ঐ মুহূর্তটিতে যে বিশেষ অনুভূতি তাঁর অন্তস্তলে কম্পনের সৃষ্টি করছে তাদের প্রত্যেকটিকে আয়ত্ত করে কবিতার প্রতিটি শব্দে অনুরূপ কম্পনের সৃষ্টি করতে হবে। এক কথায়, যে রোমাঞ্চ তিনি নিজে অনুভব করছেন সেইটি জাগিয়ে দিতে হবে রসিক পাঠকের চিত্তে।

কাব্যসত্যের এই রূপান্তরসাধনই আধুনিক কবির মৌলিক দান। সাধারণভাবে বলা যায়, উনিশ শতকের সমস্ত ধ্যানধারণা—ওআর্ডসওআর্থের সর্বেশ্বরবাদ, কিটসের সৌন্দর্যস্তুতি, ব্রাউনিংয়ের আশাবাদ, প্রির‍্যাফেলাইটদের রূপতান্ত্রিকতা, মেরিডিথের পৃথিবী দর্শন—এখন পরিত্যক্ত এবং যা আগে ছিল কাব্যসৌন্দর্যের আকর—যেমন নাইটিংগেল, চাঁদ, ড্যাফোডিল ফুল অথবা সূর্যাস্ত—তাকেও নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আধুনিক লেখকের যুক্তি এই যে অতিরিক্ত সৌন্দর্যমদিরা পান করে কবিতা ভগ্নস্বাস্থ্য ও হতশ্রী, অতএব বর্তমানে তিক্ত ও কষায় রসের পরিবেশনই শ্রেয়স্কর। দক্ষিণ আমেরিকার কবি সিলভা বলছেন :

অভাগা সাহিত্যিক পাকযন্ত্র
তুচ্ছ বিষয় নিয়ে
আর চোখের জলে ভরা
কবিতা পড়ে অবসন্ন।
ঐ পথ্য এখন ছাড়ো
ইতিহাস পুরাণ আর নাটক
আর সমস্ত আধা-রোমান্টিক
হৃদয়াবেগ।
যাতে রোগের উপশম ও শক্তিবৃদ্ধি
সেই চিকিৎসা শেষ কর—

একবার এই তিক্ত নির্যাসের
এক মাত্রা পরীক্ষা করে দেখ।[২৩]

বিষয়বস্তু আধুনিক হলেই যে কবিতা আধুনিক হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু 'ফিউচারিজম'এর প্রবর্তক ফিলিপো তোমাসো মেরিনেত্তি এইরকম একটা মতই জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন। যেহেতু আমরা যন্ত্রযুগে বাস করি সেহেতু তাঁর মতানুসারে কাব্যের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ, রেডিও, মেশিনগান ইত্যাদি। গতিবেগ, উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্যকে তিনি বলতেন আধুনিকতা, এবং এইটে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন লোকের মুখে চড় মেরে ('the slap in the face')। রাশিয়ান কবি মায়াকোভস্কিও প্রথমে এইরকম চপেটাঘাত করেছিলেন 'সাধারণ রুচির মুখে', তবে তাঁর ফিউচারিজমকে বলা যায় প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস, যদিও সে উচ্ছ্বাসের পিছনে ছিল সমসাময়িক জীবনসত্যকে আবিষ্কার করার আন্তরিক প্রয়াস। পরে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অধিবক্তা হিসাবে।

ফিউচারিস্ট কবিতায় আমরা বর্তমান জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই না। নিষ্ঠার সহিত যাঁরা এই চিত্রাঙ্কণে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের পুরোভাগে আছেন রিলকে, এলিয়ট, লোরকা ও পাস্টারনেক। তাঁদের নিষ্ঠা উপলব্ধ জটিল সত্যের প্রতি এবং সেই সত্যপ্রকাশের গরজেই তাঁরা প্রচলিত প্রথা বর্জন করে নূতন রীতির প্রবর্তন করেন। প্রাথমিক অবস্থায় উপযুক্ত শব্দচয়নই একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বহুব্যবহৃত ললিতলবঙ্গলতাজাতীয় শ্রুতিমধুর শব্দ নিশ্চয় গ্রন্থিযুক্ত হৃদয়ভাবের বাহন হতে পারে না, এবং সেইজন্যে তাঁরা এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতে শুরু করেন যেগুলি রোমাণ্টিক-রীতিবিরুদ্ধ—এবং রোমাণ্টিক-ভাবপুষ্ট পাঠক সম্প্রদায়ের মতে—অকাব্যোচিত। এলিয়টের 'Ta ta. Goodnight. Goodnight'এর মতো বাখিধিতে কেউ কোনোরকম কাব্যরসের স্বাদ পান নি। কিন্তু একটু

২৩। সি. এম. বাওয়ার 'ক্রিয়েটিভ এক্সপেরিমেন্ট'এ উদ্ধৃত।

অবহিত হলে আমরা বুঝতে পারি এলিয়টের ভাষারীতিতে কোনো ভান বা কৃত্রিমতা নেই। কর্কশ ও গুরুচণ্ডালি ভাষা প্রযুক্ত হয়েছে (এখানে ডন তাঁর আদিগুরু) কাব্যপ্রয়োজন সাধনের জন্যই—চমক লাগাবার জন্য নয়। যে প্রসঙ্গে তিনি কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে এটি গ্রাম্যতাদুষ্ট নয়, আবার লেখ্য ভাষাতেও পণ্ডিতী ভাব প্রকাশ পায় নি। যথাযথ শব্দ নির্বাচনই তাঁর আদর্শ :

> The common word exact without vulgarity,
> The formal word precise but not pedantic.

সব দিক বিচার করলে দেখা যায় তাঁর শব্দকুশলতা বিস্ময়কর।

জটিল ভাব প্রকাশের জন্য শব্দকুশলতাই অবশ্য যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন যথাযোগ্য রূপকল্পের সমাবেশ, এবং এক্ষেত্রেও আধুনিক কবি সম্পূর্ণরূপে আত্মতন্ত্র। আগে আমরা যেসব রূপকল্পের উদাহরণ দিয়েছি[২৪] সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক উপমা সংমিশ্রিত হলেও মোটের উপর ভাবের পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু বর্তমানে কবি একই ভাবকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পর পর কয়েকটি অসংলগ্ন রূপকল্প প্রয়োগ করেন এবং তাতে যদি সমগ্রভাবে কবিতাটি অসমঞ্জস হয়ে পড়ে তাহলে তিনি বলেন যে চৈতন্য যেখানে খণ্ডিত সেখানে তার প্রকাশে সুরসংগতি থাকতে পারে না।[২৫] আধুনিক রূপকল্পনায় ফরাসী প্রতীকতা ও অ্যামেরিকান 'ইমেজিজমে'র আংশিক প্রভাব দেখা যায়। প্রতীকী রীতি—প্রতীকী কাব্যের অন্তর্নিহিত রোমান্টিক ভাবানুসরণের কোনো প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না—এবং ইমেজিজমের ত্রিবিধ অনুশাসন—আত্মগত ও বস্তুগত বিষয়ের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ, সর্বপ্রকার শব্দবাহুল্য বর্জন এবং ছন্দস্পন্দ অনুসারে ভাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা—অনেক ক্ষেত্রেই পালিত হয়েছে, কিন্তু কেউই স্বাতন্ত্র্যভ্রষ্ট হন নি।

২৪। চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৫। বিষয়টি আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তা ছাড়া আধুনিক কবিতার দুরূহতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা প্রথম অধ্যায়ে এবং ছন্দ তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বেশির ভাগ রূপকল্প নেওয়া হয়েছে নগরকেন্দ্রিক জীবন থেকে। এলিয়টের দৃষ্টি অতীত ও বর্তমান দুদিকেই প্রসারিত,[২৬] কিন্তু অন্য অনেকে প্রধানত রেলওয়ে, কারখানা, বিমানঘাঁটি থেকে কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। উপকরণ কিন্তু খুব কম জায়গাতেই কবিতার উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণ কবিদের ঝোঁক কৃত্রিম বাস্তবতার দিকে, পাঠকের মনে যদি একটু ধাক্কা লাগে তাহলেই তাঁরা খুশী। কেউ কেউ অবশ্য বর্তমান জীবনের বিজ্ঞানসাপেক্ষতা লক্ষ্য করে বৈজ্ঞানিক পদার্থের সাহিত্যিক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছেন, এবং তাঁদের রচনাতে এই চিন্তা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে অন্তত তাঁদের কাব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। বৈজ্ঞানিক যুগে কবির আসল সমস্যাটা কি সেই বিষয়ে ডে লুইস বলছেন: "কবিতার জন্ম জাদুতে, আর বিজ্ঞান জাদুর মহাশত্রু: কারণ জাদু বলতে বোঝায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা; বিজ্ঞানের অর্থ নৈর্ব্যক্তিক যুক্ত্যাভাস। এই কারণে মনে হয় 'বৈজ্ঞানিক' যুগে কবিতার ফুল শুকিয়ে যাবে। কিন্তু এটা যে ঘটবেই এমন কোনো কথা নেই। জাদুকর যেমন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথা থেকে দু-এক গোছা চুল বা কয়েকটা পায়ের নখ নিয়ে তার উপর কর্তৃত্ব চালায়···কবিতাও তেমনি (বিজ্ঞানের) তুচ্ছ মন্ত্র আত্মসাৎ করে এবং তাকে নিজের কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানকে পরাভূত করে"। সমস্যাসমাধানের যে উপায় এখানে নির্ধারিত হয়েছে তার কার্যকারিতা কিন্তু এখনও প্রমাণিত হয় নি। কোনো কোনো কবি বিজ্ঞানকে পটভূমিরূপে গ্রহণ করে মানুষের তুচ্ছতা ও নিঃসঙ্গতা চিত্রায়িত করেছেন, কিন্তু তার বেশী কিছু করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ (তথা আইরিশ) কবি ইয়েটস ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্বেষী, এলিয়টও তাই। বিজ্ঞানবিদ্বেষই অবশ্য এঁদের মহৎ কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে নি। সে প্রেরণা এসেছিল সুগভীর প্রত্যয় থেকে এবং বিজ্ঞানপরায়ণতা যদি সেইরকম প্রত্যয় জাগাতে পারে—এখনও পর্যন্ত সে রকম কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় নি—তাহলে বিজ্ঞানের কাব্যোপযোগিতা সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় থাকবে না।

২৬। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বাঙলা কবিতার রূপরেখা

আদি পর্ব

পূর্ব অধ্যায়ে কাব্যেতিহাসের যে আংশিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে বাঙলা কবিতার কোনো উল্লেখ নেই। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা স্বতন্ত্রভাবে বাঙলা কবিতার ক্রমবিকাশের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব এবং ভাবের সার্বভৌমত্ব অথবা কোনো বিশেষ চিন্তাধারার প্রভাব-হেতু যদি আমাদের আলোচ্য কাব্য ও অন্যবিধ কাব্যের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহলে আমরা যথাস্থানে সে বিষয়েরও উল্লেখ করব।

বাঙলা কবিতার বয়স প্রায় এক হাজার বৎসর। এই হিসাবে আধুনিক ভাষায় রচিত ভারতীয় বা ইউরোপীয় কোনো কাব্যের তুলনায় বাঙলা কবিতা অর্বাচীন নয়। ঐতিহাসিক কালবিভাগ অনুসারে এর বিভিন্ন পর্ব বা যুগ এইভাবে নির্দিষ্ট হতে পারে : প্রাক্-তুর্কী হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, তুর্কী তথা গৌড়ীয় যুগ, পাঠান-মোগল যুগ এবং ইংরেজ যুগ (ও স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী এই কয়েক বৎসর)। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের পটভূমিকা রচনা করেছে মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস, রেনেসাঁস, নব্য-ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম, শিল্পবিপ্লব ও আধুনিক ভাবধারা, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত ঠিক এইজাতীয় পটভূমিকায় বাঙলা এবং অপরাপর ভারতীয় কাব্য রচিত হয় নি।

আদি বাঙলা কবিতা প্রাচীন সংস্কৃত ঐতিহ্য বহন করে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের পথরেখা আবিষ্কার করে নিয়েছে। তবুও তৎসাময়িক অর্থাৎ মধ্যযুগের ইউরোপীয় কাব্যের সঙ্গে যে বাঙলা কবিতার কোনোরকম মিল নেই এ কথা জোর করে বলা যায় না। মধ্যযুগীয় চেতনার অন্তত একটা বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা,—ইউরোপীয় ও ভারতীয় এই দুই কাব্যেই বর্তমান। তবে তফাত এই যে মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপে যখন ঐ চেতনা

মানবিকতার প্রবল স্রোতে বিলীন হয়ে গেল তখন আমাদের দেশজ কবিতায় দেখতে পাই অধ্যাত্মবোধের সর্বাধিপত্য।

প্রাচীন বাঙলা কবিতার যে সমস্ত পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থটি প্রায় পঞ্চাশটি চর্যাগীতির একটি সংকলনবিশেষ এবং এগুলির ভণিতা থেকে রচয়িতাদের নাম জানা যায়। মোট চব্বিশটি নামের উল্লেখ আছে, যথা—কাহ্নপাদ, ভুসুকু, সরহ, কুক্কুরীপাদ, লুইপাদ, শবর, কঙ্কণ ইত্যাদি। এঁরা সবাই পদকর্তা নাও হতে পারেন। কতকগুলি নাম মনে হয় ছদ্মনাম, যেমন কুক্কুরী, বীণা ইত্যাদি, তা ছাড়া কোনো কোনো চর্যাতে হয়তো লেখকের গুরুর নাম ব্যবহৃত হয়েছে। রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য—গুহ্য সহজিয়া সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা ও উদ্গাতা। চর্যাগুলির মূলভাব সেইজন্য আধ্যাত্মিক এবং অনেক স্থলে এদের নিগূঢ় অর্থ সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে :

রাগ পটমঞ্জরী

ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।
লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ন সন্তানা।
জাহের বানচিহ্ন রূব ন জানী
সো কইসে আগমন-বেঁএ বখানী।
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পৃচ্ছা
উদক চান্দ জিম সাচ নঁ মিচ্ছা।
লুই ভণই (মই) ভাইব কীষ
জা লই আছম তাহের উহ ন দিস।

এর বাঙলা অনুবাদ: "ভাব হয় না, অভাব যায় না,—এরূপ সংবোধে কে প্রত্যয় করে। লুই বলে, বেটা, বিজ্ঞান দুর্লক্ষ ; ত্রিধাতুতে বিলাস করে, আকার ঠাহর হয় না। যাহার বর্ণ-চিহ্ন রূপ

জানা নাই তাহাকে কেমন করিয়া আগমবেদে ব্যাখ্যা করা যায়। কাহাকে কি বলিয়া আমি পাঁতি দিব; জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের মত সে সত্য নয় মিথ্যাও নয়। লুই বলে, আমি ভাবি কিসে; যাহা লইয়া আছি তাহার আভাসও দেখি না যে" (সুকুমার সেন)। চর্যাটির সাংকেতিকতা অধিকারী ছাড়া অপরে সহজ গ্রহণ করতে পারে না। অধিকাংশ চর্যার ভাষা এইরূপ সংকেতময় এবং সর্বত্রই ধর্ম- ও নীতি -শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

তবে আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমরা তৎকালীন জীবনচিত্রের আভাস পাই। শবরের একটি রচনাতে ধর্মভাবের চেয়ে নরনারীর প্রেমাবেগই অধিকতর পরিস্ফুট :

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।
... ...
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবেরা মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলি।

শবর-শবরীর এই প্রেমলীলা কিন্তু রূপকাশ্রিত, কারণ এর পরেই বলা হয়েছে, "গুরুবাক্যধনুতে নিজমন-বাণ দিয়া বিদ্ধ কর; এক শরসন্ধানে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর পরম নির্বাণ" (সেন)। রূপকের লক্ষণ অন্য চর্যাগীতিতে দৃষ্ট হয়—যেমন কাহ্নপাদের একটি কবিতাতে (১৮), ভুসুকুর একটি গীতিতে (৪৯) 'জলদস্যু কর্তৃক বাঙলাদেশ লুণ্ঠন' ও দুটি গানে (৬,২৩) মৃগয়া রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা যাই হোক এগুলিতে নিঃসন্দেহে সমসাময়িক জীবনের ছায়া পড়েছে এবং সেইজন্য চর্যাগীতি লৌকিক-ভাববর্জিত নিছক তত্ত্বকথায় পরিণত হয় নি। সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের সম্প্রদায়গত মতবাদ প্রচারেই আত্মোৎসর্গ করেছিলেন কিন্তু প্রচারধর্ম সর্বত্র তাঁদের ব্যক্তিস্বরূপকে নিষ্পিষ্ট করতে পারে নি। "আমি ভাবি কিসে; যাহা লইয়া আছি তাহার আভাসও দেখি না যে"—

লুইপাদের এই উক্তি ব্যক্তিমানসের আকস্মিক উদ্ভাসনে সমুজ্জ্বল—অধ্যাত্মবোধ এখানে গীতিকাব্যসুলভ অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।[১]

চর্যাগীতির অনন্যতা লক্ষিত হয় সংযত প্রকাশভঙ্গিতে। অলংকার প্রয়োগে সিদ্ধাচার্যেরা কোনো কার্পণ্য দেখান নি কিন্তু কোথাও মাত্রা ছাড়িয়ে যান নি। রূপক কি ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তার উদাহরণ আমরা আগেই দিয়েছি। এর আসল তাৎপর্য সম্প্রদায়বহির্ভূত লোকের কাজে দুর্জ্ঞেয় মনে হলেও চিত্রধর্মিতা অবজ্ঞার যোগ্য নয়। উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগও আতিশয্যদুষ্ট নয়। "কাহাকে কি বলিয়া আমি পাঁতি দিব ; জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের মত সে সত্যও নয় মিথ্যাও নয়"—এতে ভাবের যে গাঢ়বদ্ধতা দেখা যায় পরবর্তী কবিতায় তা দুর্লভ। কয়েকটি বাক্য প্রবাদরূপে আজও প্রচলিত, যেমন "বর সুণ গোহালী, কিমো, দুট্ঠ বলন্দেঁ,"—বরং শূন্য গোয়াল ভালো, কি হবে দুষ্ট বলদে ?

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিদের মতে চর্যাগীতির ভাষা প্রাচীনতম বাঙলা কথ্য ভাষা, তবে উত্তর ভারতে প্রচলিত শৌরসেনী ও মাগধী অপভ্রংশের সহিত সম্পর্কিত। এই ভাষার অপর একটি নাম 'সন্ধা' অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষা এবং গুহ্যতত্ত্বের বাহন হিসাবে এর উপযোগিতা সহজে অনুমেয়। চর্যাগীতির ছন্দ মাত্রামূলক এবং সর্বত্র অন্ত্যানুপ্রাস ও চরণের মধ্যস্থলে যতি ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী যুগে এর প্রভাব দেখা যায় মরমিয়া কবিতা, বৈষ্ণব-পদাবলী ও বাউল গানে।

চর্যাগীতি ছাড়া এ যুগে সম্ভবত 'ডাক' ও 'খনার বচন' লিখিত হয়েছিল। এগুলি ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য নয় কিন্তু এখানেও বাঙালীজীবনের একটা অস্পষ্ট রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে।

১। চর্যাগুলি রচিত হয়েছিল গান হিসাবে এবং প্রত্যেক চর্যার প্রারম্ভে রাগের নির্দেশ দেওয়া আছে।

প্রাক্-চৈতন্য যুগ

চর্যাগীতি লিখিত হয়েছে প্রাক্-তুর্কী যুগে, আনুমানিক অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীতে। মহম্মদ বিন বক্তিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরে প্রায় দেড়শ বৎসর যাবৎ কোনো উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখিত হয় নি। বাঙালীর এই সামাজিক বিপর্যয়ের মূলে ছিল তুর্কীদের ধর্মোন্মাদনা, হিন্দু-ও বৌদ্ধ ধর্ম-বিদ্বেষ ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব। তুর্কী আগমনের প্রাক্কালে বাঙলাদেশের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতিও ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং অনেকটা সেই কারণে বিদেশীয়দের কোথাও কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। এই সামাজিক বিশৃঙ্খলার প্রধান হেতু আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংঘাত এবং উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে উৎকট বিভেদ। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রেণীবৈষম্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়, এমন কি হিন্দুমুসলমানের মধ্যেও ভাবের আদানপ্রদান চলতে থাকে। মোট কথা, বাঙালী হিন্দু সমাজে (বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়েছে) একটা নবচেতনার সঞ্চার হয় এবং তারই শুভ পরিণতি পনেরো শতকের সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুত্থান। চৈতন্যদেব এই নবভাবের বিগ্রহ এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই বাঙালী জীবন আবর্তিত হতে থাকে।

সমাজ যখন এই ভাবে আত্মস্থ হল তখন বাঙালীর সৃজনধর্ম আবার সাহিত্যকে আশ্রয় করলে এবং এর প্রথম সুফল দেখি আর্য ও অনার্য ভাবধারার মিলনে। বাঙলা দেশের লৌকিক কাহিনী এবং প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ—এই দুদিকেই কবিদের দৃষ্টি ধাবিত হল এবং সেইজন্য এক দিকে যেমন পাই মঙ্গলকাব্য তেমনি অপরদিকে দেখি রামায়ণ-মহাভারত-কাহিনীর বাঙলা ভাবানুবাদ। মঙ্গলকাব্যে মনসা, চণ্ডী ও ধর্মদেবতার জয় ঘোষিত হয়েছে। এই তিনটি দেবতার মধ্যে মনসা ও ধর্ম প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্করহিত, এবং অনার্যকল্পিত প্রায় সব দেবদেবীর চরিত্র নীচতা, ক্রুরতা এবং ছলে বলে কৌশলে মানুষের শ্রদ্ধার্জনের অদম্য স্পৃহার দ্বারা কলুষিত। আবার যে সব আর্য দেবদেবী অনার্যদের উপাস্য হয়েছেন তাঁদেরও অধঃপতন ঘটেছে।

শিব এখন আর যোগীন্দ্র নন, ধুতুরা ও গঞ্জিকা সেবনেই তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশী এবং পরস্ত্রীর উপর কুদৃষ্টিপাত করতেও তাঁর সংকোচ হয় না। বেহুলাকে তিনি বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন :

যদি আলিঙ্গন দাও তুমি
জিয়াইব লক্ষীন্দর পাঠাইয়া দিব ঘর
সদয় হইয়া তবে আমি।

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী বা ইংরেজ আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত যে কাব্যসাহিত্য লেখা হয় সেটি আলোচনার সুবিধার জন্য প্রাক্‌-চৈতন্য, চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর—এই তিনটি পর্বে বিভক্ত হতে পারে। বিষয় হিসাবে রচনাগুলি তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্য, পৌরাণিক কাব্যের অনুবাদ এবং পদাবলী। প্রথম দুই শ্রেণীর কবিতার প্রচলিত অভিধা হল পাঁচালী এবং এগুলি জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হত গান, আবৃত্তি এবং (কখনও কখনও) নৃত্যের মাধ্যমে। পদাবলীও বাঙলা সংগীতের একটি বিশিষ্ট রূপ এবং এদের আবেদন আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গেয় কবিতা ছাড়া পাঠ্য কবিতাও রচিত হত—তার নাম সন্দর্ভ বা নিবন্ধ।

আমরা এই দীর্ঘ যুগের কয়েকজন প্রতিভূস্থানীয় কবিরই শুধু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস ওঝা। রামায়ণ-কাহিনীকে তিনি নূতন রূপ দান করেন; বিষয়সংস্থাপন, চরিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে তিনি মূল গ্রন্থ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। দস্যু রত্নাকরের পাপক্ষয়ের বিবরণ কৃত্তিবাসের নিজস্ব কল্পনা। বাল্মীকির রামচন্দ্র যথার্থত মহাকাব্যের নায়ক—ধীরোদাত্ত, সর্বগুণান্বিত কিন্তু মানবধর্মী, অপরপক্ষে কৃত্তিবাসের শ্রীরাম 'লক্ষ্মীপতি নারায়ণ' যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন 'নরলীলা' প্রকাশ করার জন্য। তাঁর চরিত্রে বাঙালীত্বের ছাপ পড়েছে, তাঁর বীরত্বের সঙ্গে মিলিত হয়েছে বাঙালীসুলভ কমনীয়তা। দশরথ, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি চরিত্র সম্পর্কেও এ কথা খাটে।

মুনিপত্নীগণ যখন সীতাকে প্রশ্ন করেন,

দূর্বাদলশ্যাম অঙ্গে অতি মনোহর।
... ...
ধনুর্বাণ করে উনি কে তোমার হন।

তখন

লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী তিনি যে আমার॥

এখানে লজ্জাশীলা বঙ্গবধূর চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। ভাবের দিক দিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভক্তিরসপ্রধান। হনুমান এই ভক্তির জীবন্ত প্রতীক। সীতা উদ্ধারের পরে রামচন্দ্র যখন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন তখন সীতা তাঁকে উপহার দিলেন তাঁর মহামূল্য কণ্ঠহার। কিন্তু হনুমান 'ছিন্নভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে', কারণ 'রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে।' লক্ষ্মণ যুক্তি দেখালেন, হনুমানের দেহেতে যখন 'রামনাম চিহ্ন নাহি' তখন দেহধারণও মিথ্যা।

এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার।
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার॥
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ এই ভক্তিধর্মের আবেগময় প্রকাশ এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও চরিত্রের উপর লৌকিক জীবনের ছায়াপাত। তা ছাড়া ভাষার প্রাঞ্জলতা, ছন্দোনৈপুণ্য[২] (কয়েক জায়গায় ত্রিপদী ছাড়া সর্বত্র পয়ার ব্যবহৃত হয়েছে), কাহিনীর গতিশীলতা এবং প্রাণবন্ত চরিত্রসৃষ্টি যথার্থ কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। কাব্যবিচারের সর্বোচ্চ মানদণ্ড এখানে প্রযোজ্য নয়, তবুও কবির আত্মপ্রশংসা যে নিছক দম্ভ নয় এটুকু আমরা মেনে নিতে পারি :

২। মাঝে মাঝে ত্রুটি চোখে পড়ে, যেমন এই যুগ্মকটিতে :

আত্ম উপাত্তের কথা শুন ঠাকুর রাম।
তোমা বিনা অন্যপুরুষ পিতার সমান॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ রচনা করিল কবিবর ॥

প্রাক্-চৈতন্য যুগের শ্রেষ্ঠ কবি সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।[৩] এঁর কবিতার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম কিন্তু ভাগবত-পুরাণের চেয়ে এর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থুল প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে। বইটিতে মোট তেরোটি খণ্ড আছে, যেমন, 'তাম্বুলখণ্ড', 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড', 'বৃন্দাবনখণ্ড', 'বস্ত্রহরণ ও হারখণ্ড', 'বিরহখণ্ড' ইত্যাদি এবং ঘটনাবলী বিন্যস্ত হয়েছে অনেকটা নাটকীয়ভাবে, চাতুর্যপূর্ণ সংলাপের মধ্য দিয়ে। পুঁথিটির নামকরণ থেকে বোঝা যায় পদগুলি গাওয়া হত এবং প্রত্যেক পদের শুরুতে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। প্রধান চরিত্র তিনটি, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি (কুট্টনী) এবং এদের মধ্যে রাধার চরিত্রই সর্বাপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি। সাধারণ গ্রাম্য বালিকা রাধা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমনিবেদনে বিমূঢ় ও ক্রুদ্ধ কিন্তু পরে যখন বিচিত্র আঘাতে তার চরিত্র বিকশিত হয়ে উঠল তখন দেখি এই পল্লীবালিকাই রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমবিধুর নারীতে। চরিত্রটি চরম পরিণতি লাভ করেছে বিরহখণ্ডে এবং কাব্যবিচারেও এই অংশটি উৎকৃষ্ট। 'বিরহানলে' দগ্ধ হয়ে রাধা বলছেন,

মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিসের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর।
কাহ্ন বিনী সব থন পোড়এ পরানী
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।

নারীহৃদয়ের ব্যাকুলতাই এই কয়েকটি ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে, লৌকিকপ্রেমাতিরিক্ত কোনো রকম নিগূঢ় অনুভূতি—যেমন পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলিত হবার কামনা—এখানে ব্যঞ্জিত হয় নি। চৈতন্যদেবের প্রভাবপুষ্ট সাহিত্যে যে দিব্য ভাবের ইঙ্গিত আছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নায়কের প্রকাশ্য লাম্পট্যের সঙ্গে তা কোনোমতেই যুক্ত করা চলে না।

৩। পরে এই নামে একাধিক কবি পদাবলী রচনা করেছেন। সুতরাং চণ্ডীদাসকে ঠিকমতো সনাক্ত করা গবেষকদের কাছে একটি গুরুতর সমস্যা।

মালাধর বসু 'গুণরাজ খাঁ'র 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (অপর নাম 'গোবিন্দ বিজয়' ও 'গোবিন্দমঙ্গল') অনেকের মতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক প্রাচীনতম পাঁচালী। কাব্য হিসাবে মালাধরের রচনা যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়ে অনেক নীরস তা গ্রন্থ দুটির অন্তর্গত বিরহবর্ণনার তুলনামূলক সমালোচনা করলেই বোঝা যাবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে উদ্ধৃত উপরের ঐ লাইন কয়টির সঙ্গে তুলনীয় মালাধর বসু-বর্ণিত রাধার দুঃখ :

আর না দেখিব সখী সে চাঁদবদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥
আর না যাইব সখী কল্পতরুতলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে॥

উপরে যে তিনটি কাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হল তার মূল আখ্যানভাগ নেওয়া হয়েছে রামায়ণ অথবা ভাগবত থেকে। সমসাময়িক জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও এগুলি ঠিক লৌকিক কাব্য নয়। সত্যকার লৌকিক কাব্য নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য মনসা, ধর্ম ইত্যাদি দেবদেবী সম্পর্কিত মঙ্গলকাব্য। চৈতন্যপূর্ব যুগে যাঁরা মনসামঙ্গল লেখেন তাদের মধ্যে হরিদত্ত (এঁর রচনা লোপ পেয়েছে), বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল লৌকিক ও পৌরাণিক ধর্মমতের সমন্বয় সাধন এবং অনার্য বা অ-পৌরাণিক মনসাদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার। মনসাপূজার উৎপত্তি সর্পভীতি থেকে এবং পল্লীঅঞ্চলে পাঁচালী গানের শ্রোতা ছিল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়। শ্রোতৃবর্গের দেবীভক্তি যতই প্রবল হোক তারা আসলে আকৃষ্ট হত চাঁদ সদাগর-লখিন্দর-বেহুলার কাহিনীর প্রতি। চাঁদ সদাগর শিবভক্ত, কিন্তু নানা ঘটনাবিপর্যয়ে সে-ই শেষ পর্যন্ত 'কানি চ্যাংমুড়ি' মনসাকে পূজা দিলে—এইটিই কাহিনীর মর্মকথা। কিন্তু সাধারণ শ্রোতার আরও বড় আকর্ষণ হল সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু, বেহুলার ভাসান ও লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভ।

মনসামঙ্গলের কাব্যাংশ অতিশয় দুর্বল। কাহিনী অলৌকিক ঘটনায় ভারাক্রান্ত ও চরিত্রচিত্রণও অবাস্তব। পুরুষকারের প্রতিমূর্তি চাঁদ সদাগর ট্র্যাজিক চরিত্ররূপে পরিকল্পিত হতে পারত কিন্তু সে পরাভূত হল দৈবশক্তির দ্বারা এবং তাতে মনসাদেবীর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হলেও চাঁদ চরিত্র যেন সম্ভাব্য পরিণতি লাভ করতে পারলে না। এই ত্রুটি সত্ত্বেও চরিত্রটির মহত্ব আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। বেহুলার অসাধারণ মনোবল, সাহস ও চরিত্রমাধুর্য অধিকতর চিত্তগ্রাহী এবং এই দুইটি নরনারীর পাশে মনসাদেবীকে নিষ্প্রভ মনে হয়।

চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগ

চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক দান জীবনীকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী। 'জীবনীকাব্য' একটি নূতন সৃষ্টি এবং এর বিষয়বস্তু বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব এবং অদ্বৈত, শ্রীবাস, গতিগোবিন্দ, নরোত্তম প্রমুখ আচার্যগণের জীবন। জীবনীকাব্যসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন তাঁর গুরু নিত্যানন্দপ্রভুর আদেশে ও অনুপ্রেরণায়। গ্রন্থটিতে তিনটি খণ্ড আছে,—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। প্রথম দুটি খণ্ডে বাল্যকাল থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের লীলাকাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শেষ খণ্ডটি অসম্পূর্ণ, মনে হয় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে আকস্মিকভাবে। 'চৈতন্যভাগবতে'র প্রতিপাদ্য বিষয় মহাপ্রভুর অবতারত্ব এবং প্রামাণ্য হিসাবে লেখক বহু অলৌকিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট করেছেন। কিন্তু অকৃত্রিম ভক্তির বশে তিনি যেন অবিশ্বাস্য বস্তুকেও বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। গুরু নিত্যানন্দের মহিমাও তিনি প্রচার করেছেন এবং তাঁরই 'লীলাবর্ণনে' তিনি এত আবিষ্ট হয়ে পড়েন যে কৃষ্ণানন্দ কবিরাজের ভাষায় "চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।"

'চৈতন্যভাগবত'কে কিন্তু শুধু বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ মনে করলে এর উপর

অবিচার করা হবে। বইটিতে, বিশেষ করে চৈতন্যদেবের বাল্য- ও যৌবন-লীলার বর্ণনায়, পরাভক্তির সহিত সম্মিলিত হয়েছে মানবীয়তা ও সহজ কবিত্বশক্তি। আদিখণ্ডে বালক নিমাইয়ের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তাতে রং বা রেখার কোনো আড়ম্বর নেই, অথচ তাঁর আসল রূপটি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এক জায়গায় দেখি নিমাই দাঁড়িয়ে আছেন অশুচিস্থানে এবং শচীমাতার ভর্ৎসনা শুনে বলছেন,

তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে॥
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান।
সর্বত্র আমার হয়—অদ্বিতীয় জ্ঞান॥

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে পাছে নিমাইও অগ্রজের পন্থা অনুসরণ করেন এই ভয়ে পিতামাতা তাঁর অধ্যয়ন বন্ধ করে দিয়েছেন এবং দুরন্ত অথচ জ্ঞানপিপাসু বালক এই চাতুরী অবলম্বন করেছেন তাঁদের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য। বইটির যে কোনো জায়গায় এই রকম বাস্তব ছবির নমুনা মেলে। সব কিছু রেখায়িত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে এবং তারই মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় অলংকারের আকস্মিক দীপ্তিচ্ছটা :

প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা।

"নবদ্বীপলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস"—কৃষ্ণদাস কবিরাজের এ মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহত্তর ও অধিকতর প্রামাণিক জীবনীকাব্য। 'এই কাব্যটি 'চৈতন্যভাগবতে'র পরিপূরক, কারণ পূর্বগ্রন্থে যা অবর্ণিত ছিল—মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা—এখানে তা-ই বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছেও চৈতন্যদেব প্রেমের অবতার কিন্তু তিনি ঐ অপূর্ব চরিতামৃত আস্বাদন ও পরিবেশন করেছেন দার্শনিকরূপে। তাঁর একমাত্র কাম্য বৈষ্ণবতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদন এবং রচনাটিতে তিনি যে কলাদক্ষতার

পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে কদাচিৎ মেলে। বইটি যুগপৎ কাব্যধর্মী ও মননধর্মী। চৈতন্যদেব পূর্ণ ভগবান :

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঁই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঞি॥

আবার সাধারণ মানবীয় অনুভূতিও তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তিনি মায়ের দুঃখ ভুলতে পারেন নি :

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের তত্ত্বব্যাখ্যা যুক্তিনিষ্ঠ অথচ কাব্যগুণান্বিত। বৈষ্ণব আচার্যগণ মোক্ষের চেয়েও কৃষ্ণপ্রেমকে বড় মনে করতেন। এই কৃষ্ণপ্রেম তাঁদের মতে পঞ্চম পুরুষার্থ (প্রথম চারটি হল ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সম্পর্কে বলছেন,

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্যরস করে আস্বাদন॥

এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণও আত্মরূপে মুগ্ধ এবং "আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।" নিরলংকার ভাষায় কবি এখানে তাঁর বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করেছেন এবং এইটিই তাঁর সাধারণ ভঙ্গি। যখন তিনি অলংকার প্রয়োগ করেন তখন তাঁর দৃষ্টি থাকে ভাবের দিকে—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।

'চৈতন্যচরিতামৃত' বাস্তবিকই একটি মহৎ কাব্য এবং শুধু চৈতন্যযুগের নয়, সব যুগেরই গর্বের সামগ্রী।

বৈষ্ণব গীতিকবিতাও এক অপূর্ব সৃষ্টি এবং এর আবেদন অনেক বেশি ব্যাপক। চৈতন্যপূর্ব পদাবলী ছিল অল্পবিস্তর আদিরসাত্মক। এখন শ্রীচৈতন্যের পূতচরিত্রের প্রভাবে আদিরস পরিণত হল 'রক্তমাংসের সংস্রবহীন' নিষ্কাম প্রেমে। বিষয় হিসাবে সুকুমার সেন পদাবলীকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন,—(১) রাধাকৃষ্ণ পদাবলী,

(২) গৌর পদাবলী, (৩) ভজন পদাবলী ও (৪) রাগাত্মিক পদাবলী। রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর ভাববস্তু রসশাস্ত্রবর্ণিত অনুরাগ, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, সম্ভোগ, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি। আবার কৃষ্ণবিষয়ক অনেক কবিতার অবলম্বন যশোদার বাৎসল্য ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কালিয় দমন ইত্যাদি। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি এবং তাঁর আবির্ভাবের পরে যেসব রাধাকৃষ্ণ পদ লিখিত হয় সেগুলিও তাঁর প্রেমরসে পুষ্ট। পদকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরামদাস, লোচনদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্য যুগের মৈথিল পদকার এবং তাঁর মাতৃভাষাতেই তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন করেন। কিন্তু সমকালীন বাঙলা ও মৈথিলী ভাষার সাদৃশ্যহেতু তাঁর রচনাবলী বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বিদ্যাপতিকল্পিত রাধাকৃষ্ণপ্রেম আপেক্ষিকভাবে দেহাশ্রিত কিন্তু 'লাখ লাখ হিয়া'র মতো ছত্রে যে অনন্ত কামনা ব্যক্ত হয়েছে ইন্দ্রিয়বন্ধনে তা বাঁধা পড়ে নি। এই অন্তহীন আকুলতাই পদাবলী সাহিত্যের মূল সুর। শ্রীরাধার অন্তরে যখন পূর্বরাগের সঞ্চার হল তখন,

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥

জ্ঞানদাসের বর্ণনাও অতুলনীয়:

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

আবার যখন আক্ষেপানুরাগে রাধার হৃদয় জর্জরিত তখন:

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
... ...
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

মিলনেও শান্তি নেই। মিলনমুহূর্তেও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণরাধা 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে, বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' আর যখন 'মথুরাপুর মাধব গেল' তখন শুধু 'গোপ-গোপী'-ই বিরহে কাতর নয়, পশুপক্ষীরও একই অবস্থা :

রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥

বৈষ্ণব পদাবলীর অসাধারণত্ব মান অভিমান, মিলনের আনন্দ বা বিরহের দুঃখ প্রকাশে নয়, অনুরূপ সুতীব্র আবেগের অভিব্যক্তি অন্য অনেক গীতিকবিতাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু যা বিশ্বসাহিত্যে বিরল তা হল প্রেমের ঐকান্তিক আত্মনিবেদন।

বাৎসল্যরসসিক্ত পদগুলিও, যেমন বলরাম দাসের রচনা, কাব্যগুণে হীন নয়। একটি পদে শ্রীদাম সুদাম বলরামকে যশোদা মিনতি করে বলছেন, বনপথে

গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
... ...
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন।

এই ভাবের প্রতিধ্বনি করেছেন 'দাস বলাই' :

না জানি ভ্রমিলা কোন গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভকিল চরণে॥

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী 'ত্রিভুবনমণ্ডন' শ্রীচৈতন্যের অসীম করুণা, দিব্যোন্মাদনা, বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাস গ্রহণে শচীমাতার বেদনায় উচ্ছলিত। রাগাত্মিকা পদাবলী সহজিয়া ভাবের দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং এদের ভণিতায় নাম পাওয়া যায় চণ্ডীদাস, (পূর্বোক্ত চণ্ডীদাস নন) নরহরি ও নরোত্তম দাসের। 'পিরীতি' শব্দটি এঁরা সাংকেতিক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

সখি পিরীতি আখর তিন
... ...
পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাঁধিব ঘর
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব এ বিনু সকলি পর।

মানবন্দনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদ,

শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

চৈতন্য পদাবলীতে দিব্যভাবের প্রাধান্য, আর এখানে মানবের উপরই দেবত্বারোপ হয়েছে, কিন্তু কোনো বৈষ্ণব কবিতা শুধু বৈষ্ণবের তরে নয়। তার সর্বজনীন আবেদন ও কাব্যোৎকর্ষ মানবীয়তার উপরই নির্ভরশীল।

বেশির ভাগ পদাবলীই প্রচলিত রচনারীতির প্রাণহীন অনুবৃত্তি, কিন্তু যে সব পদ বাস্তবিকই রসোত্তীর্ণ সেগুলি বিশ্বের সর্বোত্তম গীতিকবিতাসমূহের সহিত উপমেয়। ভাবের গভীরতা ও অভিব্যাপ্তির দিক দিয়ে এগুলি অনতিক্রম্য। 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর'—এই একটি ছত্র যেন :

বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত-মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে মঙ্গলকাব্যের লোকপ্রিয়তা একটুও কমে নি। এবং মনসা, চণ্ডী, শিব, ধর্ম, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশে বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। কাব্য হিসাবে অধিকাংশ রচনাই অবিচার্য। একমাত্র স্মরণীয় সৃষ্টি 'কবিকঙ্কণ' মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গলকাব্য'। চণ্ডীকাব্যের আখ্যানভাগ গঠিত হয়েছে শিব-সতী-পার্বতী, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনা উপাখ্যানের দ্বারা। কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনীই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, কিন্তু শিব-সতী-পার্বতীর ছবিও কম কৌতুকাবহ নয়। শিবের শিবত্ব এখন লুপ্তপ্রায়, পার্বতী ও 'কার্তিক-গণাই'কে নিয়ে তিনি শ্বশুরালয়ে কালাতিপাত করছেন এবং সেইজন্য পার্বতীকে মায়ের গঞ্জনা শুনতে হয় :

মিছে কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস
অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বারো মাস।

কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে চণ্ডীর বরে কালকেতু কর্তৃক রাজ্যপত্তন ও দুর্বৃত্ত ভাঁড়ুদত্তের ব্যর্থ চক্রান্ত। ধনপতি-খুল্লনা উপাখ্যানের মুখ্য উপাদান ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা, সিংহলের কারাগারে প্রথমে ধনপতি ও পরে শ্রীমন্তের বন্দিদশা, চণ্ডী দেবীর প্রসাদে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে শ্রীমন্তের অব্যাহতি লাভ, এবং পরিশেষে পিতাপুত্রের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

মুকুন্দরামের কাহিনী নিতান্তই মামুলী। তাঁর মৌলিকত্ব নাটকীয় পরিস্থিতি উদ্ভাবনে ও বাস্তবানুগ চিত্র ও চরিত্র অঙ্কনে। প্রত্যেকটি চরিত্র—যেমন ভাঁড়ুদত্ত, বেনে মুরারি শীল কিংবা খুল্লনার সপত্নী লহনার দাসী দুর্বলা—সুকল্পিত ও জীবন্ত। এরূপ চরিত্রচিত্রণ সম্ভব হয়েছে কবির বাস্তববোধ ও পর্যবেক্ষণশক্তির জন্য। তিনি যেমন চণ্ডীবন্দনা করেছেন তেমনি আবার সেকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, নগরনির্মাণপদ্ধতি, আদিগঙ্গার তীরবর্তী প্রাচীন গ্রাম ও নগর, রাজদরবার ইত্যাদিরও চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন, এবং সব মিলিয়ে তিনি যে জীবনআলেখ্য রচনা করেছেন তাতে তাঁর ঐতিহাসিক চেতনা ও স্বাভাবিক কাব্যপ্রতিভা দুইই সম্যক স্ফুরিত হয়েছে। সমাজজীবনের সঙ্গে তিনি নিজের জীবনেরও ছবি এঁকেছেন। কবিকঙ্কণের আত্মকাহিনী যথার্থতই তাঁর আত্মপরিচিতি, এবং যে মানুষটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তিনি দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অবস্থাচক্রে দেশত্যাগী ও সহানুভূতিপ্রবণ। কালকেতুর এই উক্তিটি যেন কবির নিজেরই স্মৃতিমন্থন :

খুদ কিছু ধার লহ সখীর ভবনে
কাঁচড়া খুদের জাউ রান্ধিউ যতনে।
রান্ধিউ নালিতা শাক হাঁড়ী দুই তিন।
লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ।

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস (দেব)। কৃত্তিবাসের মতো তিনিও বাঙলাদেশের জাতীয় কবি এবং কৃত্তিবাসের মতো তাঁরও খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার কারণ পৌরাণিক কাহিনীতে

লৌকিক ঐতিহ্যের অধ্যাস ও ভক্তিরসের প্রাধান্য। রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে এঁদের মতো আরও অনেকে পাঁচালী লিখেছেন এবং বিশেষজ্ঞদের মতে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের গ্রন্থ দুটির কতক অংশ এই সব কবিরই লেখা। কাশীরাম সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে:

আদি সভা বন বিরাটের কত দূর
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।
ধন্য হইল কায়স্থ-কুলেতে কাশীদাস
তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ।

মহাভারতের বাকী পর্বগুলির রচয়িতা সম্ভবত কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস।

সতেরো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙলা কাব্যজগতে দেখি মানুষ যেন নিজবাসভূমে পরবাসী, দেবতন্ত্রই সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, নরনারীর অবস্থিতি শুধু দেবতাদের জয় ঘোষণা করবার জন্য। দেবতাদের এই প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও যখন আমরা মানবীয়তার স্পর্শ পাই তখন সহর্ষ বিস্ময় বোধ করি, কিন্তু এ কথা ভুলতে পারি না যে মুকুন্দরামের মতো বাস্তবনিষ্ঠ কবিও অলৌকিক শক্তির মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পড়েন। ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অবশ্য কোনো মন্তব্য করা চলে না, কিন্তু কবির যা প্রাথমিক দায়িত্ব—কাব্যগত সম্ভাব্যতা রক্ষা—সেইটিই যদি পালিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে—শিল্পক্ষেত্রে অন্তত—ঐ অধ্যাত্মবিশ্বাসের কোনো দাম নেই। আদিমধ্যপর্বের অধিকাংশ বাঙালী লেখক প্রচলিত ধর্মসংস্কারের প্রকোপে এইভাবে নিজেদের বিড়ম্বিত করেছেন। মানুষকে দৈবশক্তিঅনপেক্ষ মানুষ হিসাবে কল্পনা করার মতো দুঃসাহস তাঁরা সঞ্চয় করতে পারেন নি এবং সেইজন্য কানু, শিব বা চণ্ডী ছাড়া তাদের অন্য গীত ছিল না।

এই দুঃসাহস প্রথম দেখান সতেরো শতকের মুসলমান কবি দৌলতকাজী। তাঁর 'সতী ময়না' ধর্মভাববর্জিত লৌকিক প্রণয়কাব্য।[৪] কবিতাটি শেষ করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং

৪। বিদ্যাসুন্দরকাহিনী অবলম্বনে আগেই লৌকিক কবিতা লেখা হয়েছে। কিন্তু তার সাহিত্যিক মূল্য অতিশয় নগণ্য।

তখন একে সমাপ্ত করেন সমসাময়িক কবি আলাওল। স্বামিপরিত্যক্তা ময়নামতীর দুঃখ ও অনুপম সতীত্ব কবিতাটির প্রাণ। তার বারমাস্যা অত্যন্ত মনোরম, বিশেষ করে বর্ষার বর্ণনা :

দারুণ ডাউক , দাদুরী মযুর
চাতক নিনাদে ঘন।
... ...
শাওন-গগন সঘন ঝরে নীর।

এই সব ছত্রে দৌলতকাজীর গীতিকাব্যপ্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। আলাওল 'সতী ময়না'র শেষাংশ প্রণয়ন ছাড়া মালিক মহম্মদ জায়সীর হিন্দী 'পদ্মাবত কাব্য' বাঙলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় আছে এবং অনেক স্থলে আলাওলের রচনা মূল গ্রন্থের চেয়ে অধিকতর সুখপাঠ্য। কাব্যের অন্তর্গত কয়েকটি পদ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এবং এখানে বৈষ্ণব সহজিয়া ভাব ও সুফীতত্ত্বের মিলন ঘটেছে।

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেমহস্তে বশ।

আলাওল যোগসাধনার সহিতও সুপরিচিত। এক জায়গায় তিনি বলছেন, 'অনাহত শব্দমধ্যে' মন যখন 'লীন' হয় তখন

কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রাবত
সর্পরূপ ধরি রহে সুষুম্নার পথ।

আমাদের আলোচ্য যুগেব শেষ দুজন কবি হলেন ভারতচন্দ্র রায় ও রামপ্রসাদ সেন। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, এবং সংস্কৃত ও ফরাসী রচনারীতি অনুসাবে এবং তাঁর স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও শাণিত বুদ্ধিব সাহায্যে তিনি যে কাব্যাদর্শ গড়ে তোলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তারই অনুবৃত্তি চলতে থাকে। ভাববিলাসকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি কবিতাকে করেন যুক্তিপ্রধান এবং সর্বত্রই অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে তাঁর বহির্দৃষ্টি বেশী সক্রিয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' এবং পূর্বতন মঙ্গলকাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা করলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব বুঝতে পারা যাবে। ভারতচন্দ্রের

পূর্বসূরীরা একান্তভাবে দেবীর শরণাগত কিন্তু দৈবশক্তিতে তিনি যে অতটা আস্থাশীল নন তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আদিরসাত্মক 'বিদ্যাসুন্দর'কাহিনীর যোজনা। ভারতচন্দ্রকথিত বিদ্যাসুন্দরকাহিনী সর্বশ্রেষ্ঠ, যদিও স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদোষ বর্তমান যুগে অসহনীয় মনে হয়।· উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এইটিই সবচেয়ে লোকপ্রিয় কাব্য ছিল।

শব্দকুশলতায় ভারতচন্দ্র প্রায় অদ্বিতীয়। তৎসম ও তদ্ভব এবং 'যাবনী' অর্থাৎ ফারসী শব্দ মিলিয়ে তিনি যে ভাষারীতি গঠন করেন তাঁর নিজের মতে সেইটিই সাধারণ পাঠকের কাছে 'রসাল' ও 'প্রসাদ'গুণসম্পন্ন। বিষয় অনুসারে তাঁর ভাষা কখনও লালিত্যপূর্ণ:

কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে

কখনও ধ্বনিগম্ভীর:

অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা

কখনও আবার কথ্যভাষার অনুরূপ:

পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।

কোনো স্থলেই, এমন কি অলংকৃত বাক্যেও (ভারতচন্দ্রের অলংকার-প্রীতি খুব প্রবল) প্রাঞ্জলতার অভাব নেই। ভারতচন্দ্রের বহু অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে, যেমন: 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন', 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে', 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়', 'খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট'। তাঁর ছন্দকুশলতাও অসাধারণ। বাঙলা ও সংস্কৃত এই দুই রকম ছন্দেই—যথা পয়ার, লঘু এবং দীর্ঘ ত্রিপদী ও চৌপদী, মালঝাঁপ, একাবলী, তোটক, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত ইত্যাদিতে—তার সমান দক্ষতা।

শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেনও[৫] বিদ্যাসুন্দরকাহিনী

৫। একাধিক কবি রামপ্রসাদ নামে পরিচিত ছিলেন।

অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, এবং জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এটি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের সহিত তুলনীয় না হলেও কাব্যগুণে অপকৃষ্ট নয়। ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তাঁর অনধিকৃত কিন্তু চরিত্রচিত্রণে ও সাধারণ মানবীয় ভাবপ্রকাশে তিনি অধিকতর পারদর্শী। রামপ্রসাদের খ্যাতি অবশ্য তাঁর শ্যামাসংগীতের জন্য, তান্ত্রিক সাধনার ভয়াবহ্‌ পশ্চাৎপটে সুকুমার হৃদয়বৃত্তির রূপায়ণ তাঁর আশ্চর্য মৌলিক প্রতিভার অভিজ্ঞানস্বরূপ। যে কালী ভয়ংকরী, 'করালবদনা', ভক্ত কবির দৃষ্টিতে :

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে···
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে, 'আনন্দ'রসে মগনা।

তিনি 'জগ-মনোমোহিনী', 'করুণাময়ী' ও 'পরামৃতফলদায়িনী', এবং তাঁরই 'অভয় পদে প্রাণ' সমর্পণ করে রামপ্রসাদ দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারেন, 'আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি।' তিনি দুঃখভারাতুর, কিন্তু তবুও দুঃখবাদী নন। তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কথ্য ভাষার অকৃপণ প্রয়োগ। যেমন, 'ভূতের বেগার', 'গাছের পাড়া তলার কুড়া' ইত্যাদি। আবার ইচ্ছামতো তিনি ভাষাকে অলংকৃতও করেন :

অধর সুললিত বিম্ববিনিন্দিত
কুন্দবিকশিত সুদশনা।

তবে সাধারণত তিনি প্রাকৃত জীবন থেকে আলংকারিক উপকরণ সংগ্রহ করেন, যথা 'কলুর চোখবাঁধা বলদ', 'মানব জমি', 'মন নেয়ে'। রামপ্রসাদী গানের জন্ম যেন পল্লীবাঙলার সরস মৃত্তিকাতে, এবং বাঙালীর কাছে তাই এর এত সমাদর।

আধ্যাত্মিক বাউল গান সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে বাঙলা কবিতার আদি-মধ্যপর্ব সমাপ্ত করব। বাউল গানগুলি দেহতত্ত্ব ও সহজিয়া সাধনতত্ত্ব বিষয়ক। বাউলদের ধারণা, মানুষের মধ্যেই আছে

চিদানন্দময় নিত্য সত্য, এবং সেইজন্য তাঁরা ঈশ্বরকে অথবা তাঁদের ভাষায় 'মনের মানুষ'কে খোঁজেন মানবদেহে :

আছে আছ মক্কা এই মানবদেহে
দেখ না রে মন ভেয়ে
দেশ-দেশান্তর দৌড়িয়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে। (লালন ফকির)

বাউল গানে দুঃখের সুরই সবচেয়ে তীব্র : 'আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা', এবং রামপ্রসাদ ও বাউল কবির প্রভেদ এইখানেই।[৬] কিন্তু প্রকাশরীতির দিক থেকে দুজনে সমপন্থী।

উনিশ শতক : যুগসন্ধি

কবিতার নূতন যুগ আরম্ভ হল বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ যুগসন্ধির নির্দেশক অর্থাৎ আধুনিক যুগের পূর্বসংকেত। প্রাচীন চিন্তাধারা ও নবলব্ধ পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংঘাতে সমাজমানস এখন বিক্ষিপ্ত, এবং যুগসন্ধির অদ্বিতীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা এই বিক্ষেপের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিফলন। ঈশ্বরচন্দ্র বাঙলাদেশের আদি ব্যঙ্গকবি (মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কবিতাতেও বিদ্রূপের প্রকাশ আছে, কিন্তু বিদ্রূপ তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল না), এবং তাঁর কশাঘাত পড়ে নব্যভাব ও সামাজিক ক্লৈব্যের উপরে। তাঁর কবিতা অবশ্য নেতিবাচক নয়, বাঙালী চরিত্রের নৈতিক উন্নতিবিধানেও তিনি সচেষ্ট হন। ব্যঙ্গের ছলে অনেক কবিতাতে তিনি দেশাত্মবোধ ব্যক্ত করেন :

কিছুদিন মা দয়া করি রপ্তানিটা বন্ধ রাখো
ধনে প্রাণে হল কাঙালী
... ...
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে চালের জাহাজ চেলো না।

তিনি পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিক এবং আনারস, ছাগমাংস, তপসী মাছ— সবেতেই তাঁর চিত্ত ও রসনা যুগপৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এইরূপ সাধারণ বিষয়ের সরস বর্ণনা বাস্তবিকই উপভোগ্য :

৬। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায় ('আনারস')
রসভরা রসময় রসের ছাগল
কর্ষিত কনক কান্তি কমনীয় কায় ('তপসীমাছ')

তাঁর ভাবরীতি ভারতচন্দ্রের আদর্শানুগ, এবং এই হিসাবে তিনি পুরাতন ঐতিহ্যের উত্তরতম সাধক।

প্রাক্-রবীন্দ্র যুগ

গুপ্তকবির কাব্যাদর্শ বহুদিন যাবৎ, এমন কি মধুসূদনের যুগেও, কবিযশঃপ্রার্থীদের অনুপ্রাণিত করে। প্রথম আধুনিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সবিশেষ প্রভাবিত হন ইংরেজী কাব্যের, বিশেষ করে মূর-স্কট-বায়রনের রোমান্সের দ্বারা। রাজপুত ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত 'পদ্মিনীরূপাখ্যান' 'কর্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' রোমান্সশ্রেণীভুক্ত গাথাকাব্য। রঙ্গলাল কিন্তু রোমান্টিক কল্পনায় আত্মহারা নন। বিদেশী শাসন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ এবং তার প্রমাণ ঐ তিনটি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত দেশপ্রীতি- ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক অংশগুলি। অপর একটি রোমান্টিক গাথাকাব্যের নাম 'কাঞ্চীকাবেরী'। উৎকল ইতিহাসের অধ্যায়বিশেষ এর বিষয়বস্তু। এখানে তিনি ইতিহাস ছাড়া পুরাতত্ত্ব থেকেও কাব্যোপকরণ সংগ্রহ করেন। কবিতাটি ভক্তিরস-প্রধান, রঙ্গলালের সাহিত্যপ্রয়াসের মূল্য অনেকটা ঐতিহাসিক, সত্যকার কাব্যসিদ্ধি তিনি লাভ করতে পারেন নি।

মধুসূদন দত্ত এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। প্রাচীন কাব্যঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবের দ্বারা বাঙলা কবিতাকে উজ্জীবিত করেন। মরা নদীতে প্লাবন আনার জন্য এরূপ বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল এবং মধুসূদনের দ্বারা এটি সম্ভব হয়েছিল তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার জন্য। আধুনিক যুগ মহাকাব্য সংরচনের প্রতিকূল হলেও তিনি এক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যলাভ করেছিলেন। ত্রুটি আবিষ্কার খুব সহজসাধ্য কিন্তু ভাব ভাষা ছন্দ

সবদিক দিয়েই তিনি নূতন কাব্যের পথিকৃৎ এবং তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্য' ও 'চতুর্দশপদাবলী' যথার্থই যুগান্তকারী রচনা। বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন হয়েও তিনি সংস্কৃত কাব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল :

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয় ('শর্মিষ্ঠা')

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব আছে, যদিও ভাবের যুগোচিত পরিবর্তন ঘটেছে :

সাগর-বিরহে যদি প্রাণ কাঁদে তব নদি
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?

মধুসূদনের বাঙালী মনের পরিচয় আছে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে, এমন কি 'মেঘনাদবধকাব্যে'ও, যেমন নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলিতে :

বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে।

অথবা,

গুঞ্জরিলে অলি
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।

মধুসূদনের আত্মসচেতনতা অতিশয় উগ্র। 'চতুর্দশপদাবলী' তাঁর লিরিকপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বহু কবিতাতে একটা করুণ বিষণ্ণতার ছায়াপাত হয়েছে :

হৃদয়-কাননে,
কতশত আশালতা শুকায়ে মরিল ;
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে।

'আত্মবিলাপ' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

মধুসূদনপ্রবর্তিত মহাকাব্যরীতির অনুবর্তন দেখা যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের কবিতায়। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্যে' বিষয়বস্তু দধীচির অস্থিদান কিন্তু এই মহৎ বিষয় অবলম্বন করেও তিনি মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য ও বিরাটত্ব সৃষ্টি করতে পারেন নি। দধীচি চরিত্র নিতান্তই অবহেলিত এবং কাহিনীর নায়ক বৃত্রাসুর

'সাধারণ ভালোমানুষের অপেক্ষাও কোমলহৃদয়' (সেন)। অসুর চরিত্রগুলি অবশ্য কতকটা প্রাণবন্ত, বিশেষ করে বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা, কিন্তু দেবতারা যেন ছায়ারাজ্যের অধিবাসী—কোথাও তাঁদের সাকারত্ব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। 'বীরবাহুকাব্য' দেশাত্মবোধক রচনা :

এবে সেই দেশমান্য ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে।

হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গকবিতাবলীতেও (এখানে গুপ্তকবির প্রভাব স্পষ্ট) স্বাদেশিকতার ভাব বিদ্যমান। তাঁর কয়েকটি লিরিক কবিতাও উল্লেখযোগ্য—যথা 'যমুনাতটে', 'লজ্জাবতী', 'জীবন-মরীচিকা' ইত্যাদি।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং কাব্যত্রয়ী 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসও' মহাকাব্যশ্রেণীয় নয়। কাব্যত্রয়ীর বিষয়বস্তু অতিশয় মহান : শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এক ধর্মরাজ্য স্থাপন—যে রাজ্যে

এক জাতি মানব সকল
... ...
একই ব্রাহ্মণ তার—মানবহৃদয় :
একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম সাধন।

কিন্তু আখ্যানভাগের বিভিন্ন ঘটনাবলী সর্বত্র এই উদার ভাবকেন্দ্রের অভিগত নয় এবং তার ফলে মূল বিষয়টি অস্ফুট রয়ে গেছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' ধিক্‌কৃত পরাধীন বাঙালীর মর্মান্তিক আত্মবিলাপ। পরাজিত মৃত্যুশয্যাশায়ী মোহনলালের খেদোক্তি কবিরই হৃদয়োত্থিত বাণী। নবীনচন্দ্রের প্রধান ত্রুটি পরিমিতিবোধের অভাব ; ঘটনাকে তিনি অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘবিলম্বিত করেন এবং বস্তুগত ও আত্মগত বিষয় তিনি এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেন যে আসল বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যায়। এইখানেই গাথাকাব্যগুলির দুর্বলতা। গীতিকবিতা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ কিন্তু সেখানেও সংযমের প্রয়োজন। নবীনচন্দ্রের অনেক গীতিকবিতায় এই সংযমটুকুও রক্ষিত হয় নি। তা ছাড়া ভাষাপ্রয়োগেও স্থানে স্থানে শৈথিল্যদোষ দেখা যায়।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর পথ স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতা স্ফূর্তি লাভ করেছে রোমান্টিক গীতিকাব্যের জগতে। তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা, সৌন্দর্যানুরাগ, নিসর্গচেতনা ও পলায়নী মনোবৃত্তি। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তিনি খেদোক্তি করেন, দুর্বার রাক্ষস আমাদের 'স্বাধীনতাসীতা' হরণ করেছে, কিন্তু

হা হা মাতঃ আমরা অসার কুসন্তান,
কোন প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা।

কিন্তু এ অনুশোচনা নিতান্তই সাময়িক। সৌন্দর্যলক্ষ্মীই তাঁর একমাত্র উপাস্য দেবী, যিনি বিরাজ করেন 'ব্রহ্মার মানস সরে', তরঙ্গমুখর মহাসমুদ্রে অথবা 'নীলোজ্জ্বল-রূপ গগনমণ্ডলে'। বিহারীলালের ভাষায় মৌলিকতা আছে—যেমন সাধু ও প্রচলিত শব্দের অবাধ মিলন—কিন্তু ভাব ও ভাষা সর্বত্র পরস্পরের সহিত অন্বিত নয়:

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড বোঁ-বোঁ করে ধায়।

'বোঁ-বোঁ' এখানে একটু শ্রুতিকটু।[৭]

গীতিকাব্যের ধারা বহমান থাকে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু ও কামিনী রায়ের রচনাতে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও শক্তিমান লেখক কিন্তু তাঁর কবিপ্রসিদ্ধি ব্যঙ্গরচনা ও দেশাত্মবোধক গানগুলির জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। যুগস্রষ্টা হিসাবে তিনি তুলনীয় কেবল দান্তে ও শেক্সপিয়রের সঙ্গে (স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই দুজন ইউরোপীয় কবি অনতিক্রম্য) আর প্রতিভার বহুমুখিতার বিচারে তিনি তুলনারহিত। একাধারে কবি, সুরকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার এবং চিত্রকর—এ পরিচয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথের, এবং সেইজন্য আমাদের গর্ব শুধু 'বাঙালী আজ গানের

৭। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের কবিতা আংশিকভাবে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

রাজা' বলে নয়, ললিতকলার সর্ববিধ রূপচর্চাতেই তাঁর অত্যাশ্চর্য সিদ্ধিলাভের জন্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার আদিতে 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) এবং অন্তে 'শেষলেখা' (১৯৪১)। আদিরও আগে কৈশোরের রচনা, কবি নিজে যাকে বলেছেন 'ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত বাল্যলীলার লজ্জা', এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'। পদাবলীর অন্তর্গত দুটি কবিতা 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম-সমান' ও 'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়' বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভাবের অনুবর্তন হলেও রসোত্তীর্ণ, তবুও গ্রন্থটি রবীন্দ্রকাব্যের একটি উপধারা মাত্র। মূল ধারার শুরু যথার্থত 'সন্ধ্যাসংগীতে'। বাহিরের সঙ্গে এখনও তাঁর জীবন যুক্ত হয় নি, 'নিজের হৃদয়ের মধ্যেই' তিনি 'আবিষ্ট অবস্থায়' আছেন :

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।

'কড়ি ও কোমলে'র (১৮৮৬) পূর্বকাল পর্যন্ত কবি এইরকম পথহারা হয়েই হৃদয়অরণ্যে বিচরণ করেছেন। নিরাকার হৃদয়ভাবকে আকার দানের ব্যাকুল প্রয়াসেই 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র উদ্ভব। এরই মধ্যে এক মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর দিব্য-দৃষ্টিতে বিশ্বসংসারের আনন্দরূপ প্রতিভাত হল এবং নিখিল জীবন-প্রবাহের 'অন্তহীন অপরিমেয়তা' তাঁর 'মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল' :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য : 'ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।'

'অন্তর ও বাহিরের মেলামেলি' প্রথম দেখা গেল 'কড়ি ও কোমলে'। এইখানে রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা এবং এর স্থায়িত্ব 'খেয়া' (১৯০৬) পর্যন্ত। প্রথম পর্বের কবিতার ভাব অস্পষ্ট

এবং ছন্দও এলোমেলো। দ্বিতীয় পর্বের রচনায় হৃদয়াবেগ সংহত রূপ নিয়েছে। বহির্বিশ্বের যে সৌন্দর্যদ্যুতি তাঁর অন্তরে বিকীর্ণ হয়েছে তারই অমলিন প্রতিসরণ দেখা যায় 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি কবিতাতে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের কামনা প্রকাশিত হয়েছে 'প্রাণ' কবিতাটিতে :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

'মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত' তিনি 'অমর-আলয়' রচনা করতে চেয়েছেন। এখনও তিনি আত্মগত, কিন্তু মনের গহনে দিকভ্রষ্ট নন। অন্তরমুখীন থেকেও তিনি অন্তর-বাহিরের মিলন সাধনের দ্বারা 'নিশীথের কারাগার' থেকে মুক্তিলাভ করে বৃহত্তর জগৎপারাবারের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কড়ি ও কোমলে'র মুখ্য আকর্ষণ এর সনেটগুলি। নারীদেহ-বন্দনার যে রাগিণী এখানে গুঞ্জরিত হয়েছে বাঙলা কাব্যে তা প্রায় অশ্রুতপূর্ব :

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়।

কিন্তু তারই মাঝখানে যে 'সযতন-গোপন হৃদয়' লুকিয়ে আছে তাও কবির অজ্ঞাত নয়। 'দেহের সীমায় আসি' তিনি যে মিলনমাধুর্য সম্ভোগ করেন তাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। নিষ্ঠুর সত্যের আঘাতে স্বপ্ন ভেঙে যায় :

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
... ...
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।

'মানসী'র (১৮৯০) 'নিষ্ফল কামনা'য় এই সুর স্পষ্টতর ;

তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
... ...
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন।

দেহের গৌরব লাঘব না করে তারই মধ্যে কবি দেহাতীত প্রেমের রহস্য সন্ধান করছেন, কিন্তু 'প্রেম আপনার নাহি পায় পথ' ('মেঘদূত'), মিলনোন্মুখ দুটি হৃদয়ের মাঝখানে থাকে অনন্ত ব্যবধান। 'অতএব

এসো থাকি দুইজনে   সুখে দুঃখে গৃহকোণে
দেবতার তরে থাক পুষ্প-অর্ঘ্যভার।

প্রেম আদর্শায়িত হয়েছে 'অনন্ত প্রেমে', এবং এখানে যিনি কবির প্রেমের অধীশ্বরী পরে তিনিই 'বিচিত্ররূপিণী' হয়ে তাঁর অন্তরে ও 'দ্যুলোকে ভূলোকে' বিরাজ করবেন। প্রণয়াদি আবেগ 'মানসী'তে প্রায়ই প্রকৃতির পটে অঙ্কিত হয়েছে। বর্ষার কবিতাগুলি কবির স্বকীয় অনুভূতিতে চঞ্চল এবং সেই সঙ্গে কালিদাস, জয়দেব ও বৈষ্ণব কবির স্মৃতিপূত। 'শ্যাম বঙ্গদেশে' বসে কবি স্মরণ করছেন, জয়দেব এক 'বর্ষাদিনে' দেখেছিলেন :

দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

নীচের ত্রিপদীটি বৈষ্ণব কবির ভাবানুসরণ :

এ ভরা বাদর দিনে   কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন 'সোনার তরী'তে (১৮৯৪)। এখানে আর পরীক্ষামূলক প্রয়াসের (যা 'মানসী'র কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায়) কোনো চিহ্ন নেই। জীবনের সঙ্গে তিনি এখন অধিকতর পরিচিত,. 'অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধূলা'র প্রতি তিনি অনাবিষ্ট নন। এই সব তুচ্ছ বিষয়কেই তিনি কল্পনাতীত মহত্ব দান করেছেন। শিশুকণ্ঠের অবোধ বাণী কবির কাছে

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব।'

'সোনার তরী'র প্রকৃতি শুধু হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র পট নয়। মানব ও প্রকৃতি এখন মিলিত সত্তা, এবং কবি স্পষ্ট অনুভব করেন,

আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। ('বসুন্ধরা')

এখানে আধ্যাত্মিকতার ইশারা আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক সর্বেশ্বরবাদী নন, 'সকলের সনে' এক হয়ে তিনি নিখিলের বিচিত্র আনন্দ আস্বাদন করতে চান। প্রমথনাথ বিশীর মতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে পদ্মানদী। বস্তুত 'সোনার তরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এই দুটি প্রধান কবিতাই নদীর কল্লোলে মুখরিত।

রবীন্দ্রকাব্যবিচারে 'মানসসুন্দরী' কবিতাটি মূল্যবান। 'মানসসুন্দরী' কবির 'খেলার সঙ্গিনী', 'মর্মের গেহিনী', আবার 'জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী'। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় যে বিদেশিনী সোনার তরী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনিও সম্ভবত এই মানসসুন্দরী। এ যাত্রা কাব্যের সৌন্দর্যলোকে, কিন্তু যাত্রাপথ যেন কবির অবিদিত। যে ভাব এই কবিতা দুটিতে ব্যক্ত হয়েছে তার বিকাশ ও পূর্ণ পরিণতি দেখা যায় 'চিত্রা'র (১৮৯৬) অন্তর্গত 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা'য়। 'আত্মপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কবিতালেখার ব্যাপারে তাঁর নিজের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, তাঁর হৃদয়ের অধিনিয়ন্ত্রীদেবী তাঁকে যা বলান তিনি তাই বলেন:

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

পরিশেষে এই 'কৌতুকময়ী' দেবী জীবনদেবতার রূপ ধারণ করেন। যে সুরে তিনি কবির বীণার তার বেঁধে দেন তা

নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার—
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী আমি কি গাহিতে পারি।

তাঁর জীবনদেবতা এখানে বিশ্বদেবতা (প্রমথনাথ বিশী : 'রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ')। কিন্তু তিনি আবার কবির 'বঁধূ', 'রাগিণী' ও 'ছন্দ' গেঁথে তিনি তাঁরই 'বাসরশয়ন' রচনা করেন।

'চৈতালি', 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা' ও 'নৈবেদ্যে' তিনি অতীত ভারতের স্বপ্নলোকে তীর্থ পরিক্রমা করেছেন—কালিদাসের মানস-কৈলাসশৃঙ্গে, শিপ্রাতটবর্তী উজ্জয়িনীতীরে ও মহাকাব্যবর্ণিত পুণ্যজাহ্নবীতীরে। 'ক্ষণিকা'তে তিনি বর্তমান জগতে ফিরে এসেছেন এবং এখানে তিনি 'ক্ষণিক দিনের আলোতে' শুধু 'ক্ষণিকের গান' গেয়েছেন। অকারণ পুলকে তিনি এখন চঞ্চল, নববর্ষায় কখনও তাঁর 'হৃদয় ময়ূরের মতো' নৃত্যরত, আবার কখনও তিনি নিজেকে কল্পনা করেন বিক্রমাদিত্যের রাজসভার দশমরত্নরূপে। তরুণতরুণীর কণ্ঠে তিনি ভাষা দান করেন আর গৃহত্যাগীর মনে তিনি 'ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি' জাগিয়ে তোলেন। 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' অনাবিল ভক্তিরসে অভিষিক্ত, 'স্মরণ' স্বর্গত পত্নীর উদ্দেশে অর্পিত স্মৃতির অর্ঘ্য, এবং 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' শিশুর মানসরাজ্য আবিষ্কারের সার্থক প্রয়াস। 'বলাকা' (১৯১৬) নূতন সুরে বাঁধা, গতিবেগ এখানে অখণ্ড সত্যরূপে প্রতিভাত।[৮] 'পলাতকা'য় দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কাহিনীর মধ্যেই অদৃষ্টপূর্ব মাহাত্ম্য আবিষ্কৃত হয়েছে। 'বলাকা'-উত্তর এই সমস্ত কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রপ্রতিভা পরিপূর্ণ স্ফূর্তিলাভ করেনি। সেই স্ফূর্তি আবার দেখতে পাই 'পূরবী'তে (১৯২৬)। আজ 'জীবনের অপরাহ্নবেলায়'

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পূরবী এখনও পর্যন্ত অসময়ের রাগিণী, আর যদি সময়োপযোগী হয়, তাহলেও কবি প্রত্যক্ষ করছেন, 'আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়'। পরবর্তী কাব্য 'মহুয়া' প্রজাপতি কন্দর্পদেবের উদ্দেশে লিখিত এবং এর আলম্বন প্রণয়ের 'সাধন' ও

৮। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'প্রসাধন'। 'সাগরিকা' এই দুইধারার সংগম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য আর এক দিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব।'

'পরিশেষ' (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকাব্য 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'ও (১৯৩৬) গদ্যছন্দে রচিত। 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'জন্মদিনে' (১৯৪১), 'আরোগ্য' (১৯৪১), ও 'শেষলেখা' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থগুলিতে আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু এখনও চিন্তার স্বচ্ছতায় তিনি বার্ধক্যজয়ী। 'প্রান্তিকে'র অধিকাংশ কবিতা লিখিত হয় গুরুতর পীড়ার পর এবং 'জন্মদিনে' (এর কতকগুলি কবিতা ছাড়া), 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' 'কবির অসুস্থ বা শয্যাশায়ী অবস্থার রচনা'। এই সব কবিতার অভিনবত্ব হল মৃত্যুপথযাত্রীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রকাশ—যা পৃথিবীর কোনো কাব্যসাহিত্যে কোনো দিন প্রকাশিত হয় নি।

দেখিলাম, অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি—
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,

এই বিচিত্র বেদনার মধ্যেই তিনি প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করছেন,

হে পূষন, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক॥

রবীন্দ্রনাথের এই শেষ বয়সের কয়েকটি কবিতা—যেমন 'রূপ-নারানের কূলে' ও 'প্রথম দিনের সূর্য'—পাঠ করলে মনে হয় তাঁর অধ্যাত্মবোধ জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অধিকতর নিগূঢ় এবং তা ব্যক্ত হয়েছে আশ্চর্য সংকেতময় ভাষায়।

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি, কিন্তু তাঁর সাজাত্য শেলি কিটস প্রমুখ ইংরেজ কবিদের সঙ্গে নয়। তাঁর নাড়ীর টান ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকে, এবং তাঁর মৌল দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়েছে উপনিষদ্, বৈষ্ণব কবিতা, বাউল গান ইত্যাদির দ্বারা। রোমান্টিক

কবি হিসাবে তিনি 'সুদূরের পিয়াসি', সীমার মাঝে তিনি অসীমের সন্ধান করেন, পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অবস্থিত পরম সত্তাকে তিনি অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে চান, কিন্তু প্রধানত তিনি জগৎ ও মানবের মহিমা গান করেন :

যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। ('গীতাঞ্জলি'.)
এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
... ...
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
('আরোগ্য')

চাওয়া ও পাওয়ার তারতম্য যে বেদনা জাগায়—এবং যা ইউরোপীয় রোমান্টিক কাব্যের মূল সুর—রবীন্দ্রকাব্যে তার বিশেষ প্রকাশ নেই। পলায়নী মনোবৃত্তিও এখানে খুব প্রবল নয়। আর কবি যে বাস্তব-বিমুখ নন তার প্রমাণ 'এবার ফিরাও মোরে', 'ঐকতান', 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কবিতা। তবে যেখানে 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু' সেখানে তিনি 'বিশ্বাসের ছবি' নিয়ে আসেন স্বর্গ হতে, স্থূল মর্ত্যলোক থেকে নয়।[৯]

রবীন্দ্রযুগ যথার্থত রবীন্দ্রনাথের যুগ। সমকালীন কোনো কবিই তাঁর সর্বব্যাপী প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারেন নি, এবং এড়ানো বোধ হয় সম্ভবপর ছিল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)—'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর খ্যাতি যতটা তাঁর অসামান্য ছন্দোনৈপুণ্যের জন্য ততটা ঠিক ভাবের গাম্ভীর্য বা গভীরতার জন্য নয়। তাঁর বিশেষ গুণ হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, নিসর্গপ্রীতি, চিত্রাঙ্কনপটুতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও দেশাত্মবোধ। তিনি বহু বিদেশী কবিতা বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং রবীন্দ্রনাথের

৯। রবীন্দ্রনাথের দিব্য-প্রেরণা, লোকোত্তর কল্পনাশক্তি, সৃজনক্রিয়া, রূপকল্পনা, প্রতীকতা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা প্রথম-চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মতে "এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।"

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা' ও 'শতনরী'। তিনি স্বপ্নলোকের কবি, সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি দেখেছেন 'স্বপ্নজালের চিকের' মধ্য দিয়ে (কালিদাস রায়)। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর প্রধান বিশেষত্ব জীবনপ্রীতি। 'সুখে ও দুঃখে' তিনি জগৎকে, বিশেষত পল্লীবাঙলাকে, ভালবেসেছেন এবং সেইজন্যই তাঁর 'কাব্যের স্রোত কল্লোলে নিরবধি'। তাঁর উল্লেখযোগ্য দান 'রেখা', 'লেখা', 'অপরাজিতা', 'জাগরণী' ও 'মহাভারতী'। কুমুদরঞ্জন মল্লিক শস্যশ্যামল বঙ্গপল্লীর একনিষ্ঠ ভক্ত কবি। উচ্ছল আবেগ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, আজীবন তিনি শান্ত মধুর রসের আস্বাদন করেছেন। ভাবপ্রকাশে কোনোরকম চেষ্টার আভাস নেই, তিনি তাঁর কাব্য লেখেন 'বিটপী ফুল ফুটায় যেমন'। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম 'উজানী', 'বনতুলসী', 'শতদল', 'রজনীগন্ধা', 'অজয়', স্বর্ণসন্ধ্যা' ইত্যাদি। কালিদাস রায়ও পল্লীকবি এবং তিনি যেমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিসর্গশোভা দেখেছেন তেমনি আবার কৃষক ও কৃষকবধূর দুঃখও অনুভব করেছেন। কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমাবেগ পল্লীপ্রীতির চেয়ে প্রবলতর এবং তাঁর 'নূতন খাতা' ও 'ব্যথার স্মৃতি' দাম্পত্যপ্রণয় ও পত্নীবিয়োগব্যথার অকৃত্রিম অভিব্যক্তি। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি কমবেশী রোমান্টিক। আধুনিকতার আবহাওয়ায় এঁদের খ্যাতি লাঘব হলেও প্রত্যেকেই একাধিক রচনার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও তিনজন কবি যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন—মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম। মোহিতলাল দেহবাদী, ইহমুখিন ও কতকটা ভোগসর্বস্ব: 'ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা'। তবুও প্রশ্ন জাগে, 'দেহেরই মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সংগীত'। মোহিতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী' ও 'স্মর-গরল'। যতীন্দ্রনাথ

দুঃখবাদী কবি। 'চারিদিক দেখে চারিদিকে ঠেকে' তিনি এইটুকু বুঝেছেন যে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় আস্থা স্থাপন আত্মপ্রতারণার নামান্তর মাত্র এবং 'নাকে শাঁখ বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাহি'। 'ঘুমিওপ্যাথি' এ ভব-রোগের একমাত্র চিকিৎসা। 'প্রকৃতির টোপ' গেলারও তাঁর লেশমাত্র অভিরুচি নাই, কারণ 'সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বক্ষ ওঠে দুঃখের জয়।' 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা' (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) ইত্যাদির অনেক কবিতায় এই দুঃখবাদের সরস, ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক প্রকাশ রয়েছে। নজরুল বিদ্রোহের সুর বাঁধেন তাঁর 'অগ্নিবীণা'য় এবং যে অনাগত দেবতাকে তিনি আবাহন করেন সে

মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চন্দ্ররূপে
ধূম্রধূপে
বজ্রশিখার মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর।

রাজনৈতিক অসন্তোষের যুগে তিনি সহজেই জনচিত্ত আকৃষ্ট করেন তাঁর ধ্বংসাত্মক মনোভাব ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির গুণে।

আধুনিক যুগ

আধুনিক বাঙলা কবিতা উদ্ভূত হয় রবীন্দ্রপ্রভাব বর্জনের ঐকান্তিক প্রয়াস থেকে। একদিকে যেমন এই প্রভাব বর্জনের প্রয়াস অপরদিকে তেমনি সমসাময়িক ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজী ও ফরাসী, কবিতার প্রভাব গ্রহণে অকুণ্ঠ প্রচেষ্টা ; অর্থাৎ আধুনিক কাব্য আন্দোলনের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের অনুরাগ বিদেশী কাব্যের উপরে এবং বিরাগ রবীন্দ্রপ্রভাবিত দেশজ কাব্যের প্রতি। তাঁদের এই বিরাগ ঠিক 'রবিকাব্যলোকের' উপরে নয়, 'রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্য-স্বভাব ও সময়স্বভাবের' (জীবনানন্দ দাস), উপরে। ঐ দু রকম স্বভাবই গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদের অর্থাৎ বিশ্ব ও মানবপ্রকৃতির ঐকাত্ম্যে সুদৃঢ় আস্থা ও সুগভীর আনন্দবোধের দ্বারা। আধুনিকপন্থীদের মতে বর্তমান যুগধর্ম রাবীন্দ্রিক জীবনদর্শনের

উৎকট ব্যতিক্রম এবং সেই কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশরীতি দুইই বর্জনীয়। যুগধর্ম কথাটা অবশ্য একটু গোলমেলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় ভাবজগতে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় সমকালীন বাঙলাদেশে সে রকম কোনো বিপর্যয় ঘটে নি, সুতরাং বাঙালী কবিদের তথাকথিত যুগচেতনা আর যাই হোক স্বকীয়অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। অবশ্য আধুনিক ভাব বলতে যা বোঝায় তা এই বিজ্ঞানের যুগে নিশ্চয়ই সার্বভৌম তবে বাঙলা কবিতায় এর প্রাথমিক প্রকাশ কিছুটা অনুকৃতিমূলক তাতে কোনো সন্দেহ নাই। পরে অবশ্য প্রাথমিক অনিশ্চয়তা বহুল পরিমাণে নিরাকৃত হয় এবং অনেকে স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে বাঙলা কবিতাকে অভিনবত্বদানে সচেষ্ট হন। বাঙলাদেশে, এই সময়ে এমন কোনো দিকপালের আবির্ভাব হয় নি যিনি এলিয়ট বা পাস্টারনেকের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন, তবে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দিক দিয়ে কাব্যপ্রবাহকে গতিশীল করেছেন, এবং আজকাল যে নূতন কাব্যরীতির বহুল প্রচলন দেখা যায় তা প্রধানত তাঁদেরই উদ্ভাবন। রবীন্দ্রনাথও শেষ বয়সের অনেক কবিতাতে এই রীতি অবলম্বন করেছিলেন, তবে তিনি ছিলেন 'জন্ম-রোমান্টিক', নূতনত্বের ধাক্কায়—আর ধাক্কাও ঠিক নয়, কেননা 'লিপিকা'তে তিনি এর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন—তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

আধুনিক কবিতার[১০] অন্যতম প্রবর্তক প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশেষত্ব সমাজের নিম্নস্তর সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা। ইংরেজ কবি মেসফিল্ডের মতো তিনি তাঁর কবিতাবলী উৎসর্গ করেছেন কামার, কাঁসারী, ছুতোর, মুটে, মজুর ও ইতরের উদ্দেশে :

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের,
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে নাই!

প্রেমাবেগ-বা ব্যক্তিগত অনুভূতি-প্রধান কবিতাতেও তিনি সাধারণ

১০। পঞ্চম অধ্যায়ে আধুনিক কবিতার গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে।

মানুষেরই মানসচিত্র এঁকেছেন। বুদ্ধদেব বসুর কবিজীবনের আরম্ভ রবীন্দ্রছায়াতলে, কিন্তু বাস্তবতার প্রখর উত্তাপ থেকে তিনি বেশীদিন নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। তাঁর প্রধান অবলম্বন প্রেম, কিন্তু এ-প্রেম দেহজ ও নশ্বর। এর 'সম্মুখে মৃত্যুর গুহা' এবং 'নতুন ননীর মতো তনু'র 'ভিত্তিমূলে' আছে 'কুৎসিত কঙ্কাল'। তাঁর ভাষারীতির অভিনবত্ব হল কথ্য বাগ্বিধির অনুসরণ এবং সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও গতানুগতিক কাব্যসুলভ শব্দ বর্জন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একান্তভাবে নৈরাশ্যবাদী কবি। 'মৃত্যু', 'অন্ধকার', 'বিভীষিকা', 'প্রেত', 'পাতাল' প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগ এই ব্যর্থতাবোধেরই পরিচায়ক। 'মনুষ্যধর্মের স্তবে' তিনি ও

নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।

সুধীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মলীনতা ও মননশীলতা। সমাসবদ্ধ শব্দ ('হিতবুদ্ধিহন্তারক' 'দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত') এবং এ যাবৎ কাব্যরচনায় প্রায় অব্যবহৃত 'অথচ', 'কিন্তু', 'অতএব' ইত্যাদি অব্যয় প্রয়োগ করেও 'তিনি রসশাস্ত্রের দাবি ও অন্বীক্ষাশাস্ত্রের দাবি যুগপৎ অক্ষুণ্ণ রেখে স্বচ্ছন্দে কাব্য রচনা করে গেছেন' (আবু সয়ীদ আইয়ুব)।

বিষ্ণু দে-ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো যুক্তিপন্থী, এবং এলিয়টের প্রভাবে তিনি হৃদয়াবেগের প্রকোপ থেকে মুক্তির প্রয়াসী। তাঁর অনেক উপমা, রূপকল্প ও শব্দসম্ভার গৃহীত হয়েছে উপনিষদ্, ভারতীয় ও ইউরোপীয় পুরাণ, রূপকথা, ছড়া, এবং শেক্সপিয়র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির বচনা থেকে, যেমন 'হোরেশিও শুধু চেনে সে ছদ্মবেশ', 'বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির', অথবা

পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উধাও,
ট্রেন এল বলে হাওড়ায়।

বিষ্ণু দের প্রথম দিকের কবিতাতেও নৈরাশ্যের সুর শোনা যায়, তবে 'জীবনের তটে তটে···নবজীবনের পলি' বিস্তারেরও তিনি স্বপ্ন

দেখেছেন। মার্কসীয় ভাবালম্বনের ফলে পরে এই স্বপ্নের আপেক্ষিক বাস্তবায়ন ঘটেছে। সমাজচেতনা অমিয় চক্রবর্তীরও স্বভাবধর্ম। জীবনের বিসংগতি ও কদর্যতা তিনি তির্যক ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন :

ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, মেয়ো কুত্তোর
আড়ত বেঁধে আছো, হাঁচো (কিমাশ্চর্য বাঁচা)
এবং যমের কৃপায় মরা।

কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক নয়। আধুনিক বিজ্ঞানকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন (এটি তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য) এবং সেই সঙ্গে এক ইন্দ্রিয়াতীত পরম শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছেন।

জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর প্রকৃতি-প্রীতি, রূপতান্ত্রিকতা[১১] ও প্রতীকতায় যথার্থ কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং প্রতীকতার মধ্য দিয়ে তাঁর যুগচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্ট করেছে হংস-বলাকার 'উদ্দাম চঞ্চল' পক্ষ আর 'আকাশে কাতর আঁখি তুলি' জীবনানন্দ দেখেছেন 'ঝরা পালকের ছবি'। মৃত্যুচেতনার প্রাবল্য তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কিন্তু এ চেতনা পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা হতাশাব্যঞ্জক নয়। মৃত্যুর অন্ধকারে বসে তিনি প্রশ্ন করেছেন,

নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অজেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে। ('সময়ের কাছে')

সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দুইই সমান সত্য :

জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

আধুনিক কালে আরও অনেকে কবিতা রচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, যথা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিতকুমার দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রমথনাথ বিশী, নিশিকান্ত রায় চৌধুরী, মণীশ ঘটক, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও দিনেশ দাস। সাম্যবাদী কবিতারচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য।

১১। চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চর্যাগীতি থেকে আরম্ভ করে বাঙলা কাব্যধারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে। সে ধারা কখনও বিশীর্ণ, শুষ্কপ্রায়, কখনও বা বেগবান ও ঊর্মিমুখর এবং উনিশ শতকের শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীতে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের একক প্রচেষ্টায় তা দুকূল প্লাবিত করে বিশ্বকাব্যপ্রবাহের সহিত মিলিত হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে সে স্রোতোবেগ মন্দীভূত হলেও বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হবার কোনো কারণ নেই।

বিষয়-নির্ঘণ্ট

* ইংরেজী ও বাঙলা কবিতা এখানে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। কাব্য-বিষয়ক সাধারণ আলোচনাতে যে সব কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হয়েছে নির্ঘণ্টে তাদের উল্লেখ নেই।

অধুনা বাঙলা সাহিত্যে নতুন মরশুম এসেছে। তাতে যেমনই বই বাড়ছে তেমনই বেড়ে চলেছে পাঠকের সংখ্যা। আজ বহু পাঠক শুধু গল্প-উপন্যাস নাটক-কবিতা পাঠ করেই খুশী নন, তাঁরা চান প্রত্যেকটি সৃষ্টিধর্মী লেখার জাত যাচাই করতে। তাই এখন সাহিত্য-পিপাসার প্রায় সমান স্বীকৃতি পেয়েছে সাহিত্য-জিজ্ঞাসা।

নিম্নলিখিত সাতখানি বই সাহিত্য-জিজ্ঞাসার মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করবার সুপরিকল্পিত প্রয়াস। সাতজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক বইগুলি লিখেছেন। লেখকদের প্রধান লক্ষ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের তথা ছাত্রের প্রয়োজন মেটানো এবং তাদের উদ্দীপিত করা।

সাহিত্যের কথা
　　গুরুদাস ভট্টাচার্য
কবিতার কথা
　　নির্মলকৃষ্ণ সরকার
নাটকের কথা
　　অজিতকুমার ঘোষ
ছোটগল্পের কথা
　　রথীন্দ্রনাথ রায়
উপন্যাসের কথা
　　দেবীপদ ভট্টাচার্য
সমালোচনার কথা
　　অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পতত্ত্বের কথা
　　সাধনকুমার ভট্টাচার্য